আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

উবায়দুর রহমান খান নদভী

প্রধান সম্পাদক ঃ ইসলামিক ইনস্টিটিউট জার্নাল

পরিচালক ঃ ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৮৪৫৩৩৭

[একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা]

আফগানিস্থানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

উবায়দুর রহমান খান নদভী

প্রথম প্রকাশঃ আগষ্ট ১৯৯৮

চতুর্দশতম মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০৮

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র।

AFGANISTANE AMI ALLAHKE DEKHECHI [I saw Allah in **Af**ganistan Written by Ubaidur Rahman Khan Nadwi **Pu**blished by Kitab Kendra, 50 Banglabazar, Dhaka-1100. **Co**mpleted Edition August. 1988, 14th Print July 2008.

Price : 100.00 U.S $ 06.

যাদের কলজে ছেঁচা খুনে
দ্বীনের চেরাগ জ্বলে,
যাদের রক্তের আখরে
রচিত হয় মিল্লাতের ইতিহাস।
সেই মরণজয়ীদের প্রতি –

বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কারক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক,
"রাবেতা আল-আদব আল-ইসলামী" বাংলাদেশের ব্যুরো চীফ,
দারুল ম'আরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা
পরিচালক, আলহাজ হযরত

মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভীর

বাণী

আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনী ভাই মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর তাজা লেখা, "আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি" বইটির বিশেষ বিশেষ অংশ আমি খোদ লেখকের মুখে শোনার সৌভাগ্য লাভ করি। আফগান মুসলমান, আফগানের মাটি বা আফগান জিহাদকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখে বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিয়ে তিনি এ বইয়ে যাকিছু আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তা আমাদের মতো আফগান সফরকারী প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেও সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

এতে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা, আফগান জিহাদের পটভূমি, জিহাদের ক্রমধারা এবং মুজাহিদীনের দ্রুত অগ্রগামী ও বিজয়ী হওয়ার মূল রহস্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলন, মুসলিম ঐক্য, বাতিলের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের কিভাবে সূত্রপাত হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে সরকার ও শাসক বদলের–এক সরকারের পতন ও আরেক সরকারের উত্থানের মূল কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। মোটামুটি আফগানের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান জিহাদে সোভিয়েত রাশিয়ার মতো সুপার পাওয়ারের মুখে ছাই-মাটি দিয়ে সারা বিশ্বের সামনে একদল গরীব কৃষক-শ্রমিক এবং মোল্লা-মুসল্লী কিভাবে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলো, সংক্ষিপ্ত হলেও তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ বইয়ের স্বল্প পরিসরে। অতঃপর এ জিহাদ হতে শিক্ষা গ্রহণ করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের মুকাবিলা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কাজে বাংলাদেশী মুসলমানদের কিভাবে অগ্রসর

হওয়া উচিৎ, তার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সবিনয়ে প্রার্থনা করিঃ হে আল্লাহ, আপনি এ বইটিকে কবুল করুন। একে তার লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য দান করুন। স্নেহভাজন লেখকের মুখ ও কলমকে আরও শক্তিশালী করে দিন এবং ইসলামী দাওয়াত, জিহাদ ও প্রতিরক্ষার পথে তাঁকে আমাদের মুখপাত্র হওয়ার তওফীক দান করুন। হে আল্লাহ, আমার অন্তরে যে ব্যথার আগুন আপনি জ্বেলে দিয়েছেন তা প্রকাশ বা ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমার নেই, এ আগুনের শিখা স্নেহাস্পদ লেখকের বুকে জ্বেলে আমাকে সাহায্য করুন। লাঘব করুন আমার অন্তরের জ্বালা।

পরিশেষে প্রাচ্যের মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতায় এই দোআ–

"জওয়ানো কো সুজে জিগর বখ্‌শ দে
মেরা ইশ্‌ক মেরী নজর বখ্‌শ দে"।

অর্থাৎ, যুবকদের অন্তরে ব্যথার অগ্নিশিখা জ্বেলে দাও, আমার প্রেম তাদের দাও, আমার দৃষ্টিশক্তি দাও–উচ্চারণ করে লিখকের সুন্দর, সুস্থ, সফল ও কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

চট্টগ্রাম
১৫.১.১৪০৯ হিঃ

মুহাম্মাদ সুলতান যওক

চলতি সংস্করণের ভূমিকা

উনিশ 'শ অষ্টাশির আগস্টে 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি' প্রথম বের হয়। একবার দু'বার করে এর বেশ কয়েকটি মুদ্রণ সম্পন্ন ও নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় পুনরায় এটি প্রকাশের চাহিদা দেখা দেয়। বইটি প্রথম প্রকাশের পরবর্তী চার বছর আফগান জিহাদ, দুশমনের ষড়যন্ত্র, নাস্তিক্যবাদের কেন্দ্রের পতন, কমিউনিজমের ব্যর্থতা, সমাজতন্ত্রের বিদায় আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুধাবিভক্তির মতো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ পৃথিবীর নাট্যশালায় একে একে মঞ্চায়িত হতে থাকে। সমকালীন বিশ্বের বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ করে অনেক উত্থান, অসংখ্য পতন। মুসলিম জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দাওয়াত ও জিহাদের ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রভূমি মধ্য-এশিয়ার ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতালাভ, আফগানিস্তানের বীর জনতার সুস্পষ্ট বিজয়, কাবুলের মুক্তি, এ সবই ঘটে যায় অতি দ্রুততার সাথে তাই আফগান জিহাদের সর্বশেষ অবস্থা সংযোজিত করে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের জন্যে প্রকাশক ও পরিচিত মহল অতিরিক্ত চাপাচাপি শুরু করে দেন। প্রথম সংস্করণে বইটি পূর্ণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম বলে তাদের চাপ ও তাগাদা মুখ বুজে সইতে হয়। এক পর্যায়ে বইটি শেষ করে দিয়ে তবে নিস্তার পাই।

নিজের মনের গভীরে গুমরে মরা অনুভূতি আর অন্তর নিংড়ানো অভিব্যক্তি, বিশ্বাস ও চেতনার কালিতে, ঈমানদীপ্ত দিব্যদৃষ্টির রং মেখে লেখার চেষ্টা করেছি হৃৎকলমের টানে রচিত প্রাণ সঞ্চারকে ও চেতনা উদ্দীপক এ বইটি। আশা করি এটি পূর্বের মতো ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনা ও ঈমানদীপ্ত উদ্দীপনা সৃষ্টির পথে সহায়ক হবে।

আল্লাহ সবাইকে নেক প্রচেষ্টায় কামিয়াব করুন। সর্বোপরি তিনি আমাদের প্রতিটি উদ্যোগকে সাদরে কবুল করুন। পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের ভূমিকা লেখার এ প্রাণবন্ত মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে গোনাহগার বান্দার এই প্রার্থনা।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ — বিনীত

জাগো মুজাহিদ কার্যালয়, ঢাকা। — **উবায়দুর রহমান খান নদভী**

লেখকের আরয

বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের ইসলামপ্রিয় জনতার অসম লড়াই সংঘটিত হলো দীর্ঘ চৌদ্দ বছর। একদিকে পৃথিবীর সেরা সৈন্যবাহিনী আর অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র, অন্যদিকে সাদাসিধে একদল আল্লাহওয়ালা মানুষ আর তাদের লাঠি-ঠেঙ্গা, দা-বল্লম, কাটা রাইফেল ও ভাঙ্গা পিস্তল। আফগান জিহাদে বিশ লক্ষ নিরপরাধ মুসলমান শহীদ হয়েছেন–হাজার হাজার মা-বোন দিয়েছেন সম্ভ্রমের কুরবানী, ষাট লক্ষ আফগান জনগণ নিজের ভিটে-বাড়ী ছেড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও ইরানে। ঠিক তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নও হারিয়েছে অগণিত সৈন্য, হাতছাড়া হয়েছে অসংখ্য জঙ্গী বিমান, গানশীপ, ট্যাংক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ী, মেশিনগান, রকেট লাঞ্চার এবং গোলা-বারুদ ইত্যাদি। দীর্ঘ প্রায় দশ বছরে ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ হারিয়ে পরাজিত, লাঞ্ছিত ও বিশ্বধিকৃত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ অবশেষে সৈন্য উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ইসলামী জিহাদের অতীত-বর্তমান, মুজাহিদদের হাল-হাকীকত ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা, রুশ দখলদারদের পাশবিকতা, দেশী কমিউনিস্টদের গাদ্দারী, জিহাদ ও শাহাদাতের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং আল্লাহপাকের প্রকাশ্য সাহায্য ও বিজয়ের আলোচনা নিয়েই আমার এ বই। তাওফীকের জন্যে আল্লাহর অশেষ হাম্‌দ।

বইটির নামকরণ করা হয়েছে একজন ফরাসী সাংবাদিকের ঐতিহাসিক উক্তি অবলম্বনে। এই খৃষ্টান সাংবাদিক তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় আফগান রণাঙ্গনে খোদায়ী মদদ ও নুসরত দেখে মুসলমান হয়ে যান। দেশে ফিরে গিয়ে বেতার-টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাতকারে ঐ ফ্রেঞ্চ জার্নালিস্ট তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ "আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি।" আফগান জিহাদ বিষয়ক বইটির নামের জন্যে আমার কাছে এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্তিটিই বেশি লাগসই মনে হয়েছে।

তথ্য-পরিসংখ্যান ও ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছি আফগান মুজাহিদদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রামাণ্য বই ডঃ আবদুল্লাহ্ আযযামের "আয়াতুর রাহমান"-এর উপর। আরব ও ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এবং বাংলাদেশী পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়ে লিখিত বইয়ের চেয়ে এই বইয়ের মান উন্নত হয়েছে। কারণ, এতে সন্নিবেশিত অনেক কথা-কাহিনী আমি নিজেই আফগান-আরব মুজাহিদ এবং আফগান সফরকারীদের কাছে শুনেছি। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, সন্দেহযুক্ত বা দুর্বল কোন বর্ণনা আমি এ বইয়ে স্থান দেইনি। যালিকা ফায্লুল্লাহ!

রেকর্ড পরিমাণ অল্প সময়ে লিখিত ও স্বল্প সময়ে মুদ্রিত এ বইখানা চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি স্বল্প জ্ঞান ও সীমিত সাধ্য নিয়ে কোন কাজে হাত দিলে এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুধী পাঠকদের সুনজর ও সহযোগিতা পেলে আগামীতে একে আরও ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

এলেম-কালাম বলতে আমার তেমন কিছুই নেই, আর আমি কোন লেখক-সাহিত্যিকও নই, কিন্তু হৃদয় জুড়ে আছে একরাশ মানবপ্রীতি ও আবেগ। অন্তরে প্রোথিত আছে হিমালয় প্রমাণ একটা ঈমান।

সেই ঈমান, আবেগ ও নিপীড়িত বনী আদমের প্রতি অগাধ ভালোবাসার দাবীতেই লিখেছি এ ক'টি পৃষ্ঠা। এতে যদি বিশ্ব-মুসলিম, বিশেষ করে বাংলাদেশের কোটি কোটি তাওহীদী জনতার একজনের বুকেও ঈমান-আকীদা-ইয্যত ও স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করার জয্বা, খোদার পথে সবকিছু কুরবানী দেয়ার অদম্য উদ্দীপনার জন্ম হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার সাফল্য।

এ বই যেন শেষ বিচারের কঠিন দিনে আমার ও আমার আব্বা আম্মার, আত্মীয়-পরিজন এবং সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর নাজাতের ওসীলা হয়, এই আমার চরম পাওয়া।

বিনীত

উবায়দুর রহমান খান নদভী

নূর মনযিল,
কিশোরগঞ্জ।

আফগানিস্তানঃ মাটি ও মানুষ

আফগানিস্তান। হাজার বছর ধরে মুসলমানদের দেশ। স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী, বে-পরোয়া এক জাতির প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি। হিন্দুকুশ পর্বতমালার প্রহরায়-পৃথিবীর ছাদ পামীরের ছায়ায় সারাটা জনম ধরে দুর্জয়-দুর্ভেদ্য আফগানিস্তান বুকটান করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের প্রীতিডোরে আবদ্ধ আফগানরা খুবই সরল-সোজা প্রকৃতির আল্লাহওয়ালা মুসলমান। পাহাড়ের রুক্ষ বুকে, দুর্গম গিরি-কন্দর আর গুহা-উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো আফগানদের স্বাধিকার চেতনা ও উদারতা বিশ্ব জুড়ে খ্যাত। ঢোলা শেলোয়ার, বিশাল কামিজ-কোর্তা আর মাথায় বাঁধা ইয়া বড় পাগড়ীই তাদের পরিচয়। কাঁধে ঝুলানো বন্দুক আর কোমরে বাঁধা খঞ্জর তাদের পৌরুষ, বীরত্ব আর জিহাদী ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। একজন আফগানকে আপনি দু'টো গালি দিন, তা সে হজম করে ফেলবে। আপনি তার গায়ে সাইকেল তুলে দিয়ে একেবারে রক্ত ছুটিয়ে দিন, একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সে নিজের পথ ধরবে। কিন্তু আপনি তার ঈমান, তার আল্লাহ-রসূল-কুরআন, তার দেশ-জাতি বা ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে মুখ খুললে আর রক্ষে নেই। সেই আফগানীর কাঁধের বন্দুক হতে বেরিয়ে আসা বুলেট আপনার বুক এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে। আপনার পেটে ঢুকে যাবে তার অতি আদরের খঞ্জর।

স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী আফগানরা আত্মমর্যাদাবোধ, আতিথেয়তা ও হৃদয়ের ঔদার্যের জন্য মশহুর। একবার একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত আফগানের তাঁবুতে একটি আহত হরিণ গিয়ে আশ্রয় নিলো। হরিণটির পেছনে যে শিকারীটি এলেন, তিনি তৎকালীন শাসক মাহমুদ গযনভী। সুলতান মাহমুদ যেই তাঁবুতে ঢুকে হরিণটি ধরতে চাইলেন, অমনি তাঁবুর মালিক বৃদ্ধ লোকটি এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো, বললোঃ "আপনি আমাদের বাদশাহ্। আমার অনুরোধ, হরিণটি আপনি ধরবেন না। কারণ, এটি এখন একজন হৃদয়বান মানুষের মেহমান হয়ে তাঁবুতে ঢুকেছে। সুতরাং একে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। জান দিয়ে হলেও আমি আমার এই অবলা অতিথিকে রক্ষা করবোই।" নিরক্ষর লোকটির সত্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস ও নির্ভীকচিত্ততা মাহমুদ গযনভীকে মুগ্ধ করলো। তিনি সেদিন খালি হাতেই ফিরে এলেন।

ভারত বিজয়ী মাহমুদ গযনভী, দিল্লীর কৃতী শাসক শেরশাহ সুরী, ইসলামের সিপাহসালার আহমদ শাহ্ আবদালী, ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানী এ দেশেরই সন্তান।

এ দেশেরই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জন্ম নিয়েছেন আবু হানীফা, বায়হাকী, বলখী, হারভী, ইবনে-হাব্বান, তিরমিযী, নাসায়ী, বোখারী, ফখরে রাযী, আল-বিরুনী, ফারাবী, ইব্নে সিনা ও খাওয়ারেজমীর মতো হীরের টুকরো ছেলেরা। শতাব্দীর দেয়ালে সাঁটা যাঁদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার। ইতিহাসের শ্বেত-শুভ্র ফলকে উৎকীর্ণ যাঁদের স্বর্ণালী হরফের নাম।

পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালে সবুজ গম খেত, পার্বত্য ঝরণার দুই পাশে নয়নাভিরাম আঙ্গুর-আপেল খেতের দৃশ্য, গ্রামের মাথায় চা-এর দোকান আর কফিখানা, দূরের হাটে হাতিয়ার বিক্রেতার দোকান ইত্যাদি ছাড়া গাঁও-গেরামের মানুষ আর বেশি কিছু বুঝে না। ভোর-বিহানে গাঁয়ের মসজিদে ফজর পড়ে, বহু পরিচিত কুরআন-খানি নিয়ে বড়রা ঘরে ঘরে বসবে আর ছোটরা কায়দা-ছিপারা হাতে মসজিদে। খাওয়ার সময় হলে গম বা যবের তৈরি বড় বড় রুটি আর দুম্বার গোশ্তের বাটি সামনে নিয়ে এক দস্তরখানে গোল হয়ে বসে বিসমিল্লাহ। শেষে তাজা আঙ্গুর-আপেল-আখরোট বা অন্য কোন শুকনো ফল। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি। কোন কোন দিন মওলবী সাহেবের কাছে বসে স্বর্ণযুগের জিহাদী কেচ্ছা আর ঈমানী কাহিনী শোনা। ব্যাস্! এ পর্যন্তই আফগানিস্তানের গেঁয়ো মানুষের সাদাসিধে জীবন।

শহরে আছে সবকিছুই। অফিস-আদালত, কলেজ-ভার্সিটি, ব্যবসাকেন্দ্র-সব। রাজা-রাজনীতি নিয়ে জনগণের ততো মাথা ব্যথা নেই। বাদশাহ্ একজন আছেন। সবাই তাঁকে ভালোবাসে। দেশের মানুষের ভালো-মন্দ দেখার জন্যে শাসকেরা আছেন–প্রতিরক্ষার জন্যে আছে সশস্ত্র বাহিনী। শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্পের জন্যে আছেন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। সাধারণ মানুষ তাই নিজেদের দ্বীন-দুনিয়ার কাজেই ব্যস্ত। যারা বয়সে প্রবীণ তাদের মনে আছে যে, কবে সেই ১৯৩৩ সালে তাদের বাদশাহ্ জহির শাহ্ ক্ষমতায় বসেছিলেন। জহির শাহের বয়স তখন উনিশ বছর। গোটা আফগান জাতি তাঁর অভিষেকের দিনটি উদযাপন করেছিলো বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায়।

প্রথম আঘাত

কিছুদিন পর আফগানিস্তানের সরল-সোজা মানুষ একদিন শুনতে পেলো, তাদের প্রিয় বাদশাহ্ নাকি এক পাগলের কাণ্ড করে বসেছেন। রাজধানী কাবুলের এক গণসমাবেশে জহির শাহ্ একটি বোরকাকে পদদলিত করে বলেছেনঃ “চিরদিনের জন্যে অন্ধকার যুগ শেষ হলো” এটা ছিল পশ্চিমাদের পক্ষ হতে চালানকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্বোধন। পঞ্চাশের দশকে সংঘটিত এ বিপ্লব মূলতঃ আফগান জনগণের নরম হৃদয়ের তুলতুলে মখমলে রক্ষিত ঈমান ও আকীদার গায়ে হেনেছিল চরম আঘাত।

শুরু হলো ষড়যন্ত্র

১৯৭৩ সালে জহির শাহ্ বিদেশ সফরে গেলে তাঁরই চাচাতো ভাই মুহাম্মদ দাউদ গদিতে বসলো। জেনারেল দাউদ ছিলো কমিউনিজমে অনুরাগী। তার ঘরেই সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের সবক নিয়েছে আফগানিস্তানের বড় বড় কমিউনিস্ট নেতারা–তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন আর বাবরাক কারমালরা।

মুহাম্মদ দাউদ প্রধানমন্ত্রিত্বের সাথে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুটোও তার হাতেই রাখলো। লাগাতার দশ বছর এ মসনদ আঁকড়ে থেকে জেনারেল দাউদ আফগানিস্তানের ইসলামী চেতনার আগুনে ছাইচাপা দিয়ে, কমিউনিজমের নতুন চারায় পানি ঢালার কাজটি খুবই দক্ষতার সাথে করতে থাকলো। এ সময় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা রাষ্ট্রীয় ঋণ বাবদ তিন মিলিয়ন রুবল খরচ করলো রাশিয়া।

গোটা আফগানিস্তানের প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, বিচার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টা নিয়োগ করে দেশব্যাপী চালানো হলো ইসলামবিরোধী তৎপরতা। কাবুলের পুতুল সরকার মস্কোর সুতার টানে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা, ধর্মীয় অনুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধের গায়ে একের পর এক ছুরিকাঘাত করে যেতে থাকলো। সরকার ও প্রগতিবাদী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলের সাথে গোপন বন্ধুত্ব করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের মাটিতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার রঙিন খোয়াব দেখতে লাগলো। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বহু সংখ্যক শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মস্কোর কৃপাদৃষ্টি লাভ করলেন। আফগান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফজীলত আত্মস্থ করে, কমিউনিজমের তালীম নিয়ে দেশে ফিরে এলো।

সারা দেশে যখন সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদী শক্তির আগ্রাসন পুরোমাত্রায় চলছে, তখনো আফগান জনসাধারণ নির্লিপ্ত, সমাজের নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামা, ইমাম ও মুআল্লিম সাহেবানও নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। মাদ্রাসা, মসজিদ, মক্তব ও খানকাহ্গুলো স্বাভাবিক গতিতেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের ভাগ্যাকাশ অন্ধকার করে নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার যে কালোমেঘ ছেয়ে আসছে, তার খবর সাধারণ মানুষেরা তখনো পায়নি।

ইসলামী আন্দোলনের সোনালী সকাল

সর্বপ্রথম ১৯৫৯ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত অনুষদের অধ্যাপক, মিসর হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজী দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং কমিউনিজমের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করে তোলার পদক্ষেপ নেন। নতুন প্রজন্মকে ইসলামী বিপ্লবের শপথে উজ্জীবিত করে সমাজতন্ত্রী পাশবিকতার হামলা প্রতিহত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। ১৯৬৮ সালে মাওলানা নিয়াজী শরীয়া ফ্যাকাল্টির ডীন নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষক এবং বুরহানুদ্দীন রাব্বানী, আবদু রাব্বির রাসুল সাইয়াফসহ অন্যান্য জোশিলা ছাত্রকে নিয়ে অধ্যাপক মাওলানা নিয়াজী কমিউনিস্ট বিরোধী দাওয়াত চালিয়ে যান। পরবর্তী সময় রাব্বানী ও সাইয়াফ শরীয়া অনুষদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইসলামী আন্দোলনের এ দাওয়াত দিনে দিনে অধ্যাপক ও বিশেষ ছাত্রদের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ ছাত্রদের কাছেও পরিচিত হয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালে দেশপ্রেমিক মুসলিম বিপ্লবী ছাত্রদের একটি সম্মেলন 'গজনী সরাই'-এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে চৌদ্দ জন ছাত্র মিলিত হন। তন্মধ্যে আবদুর রহীম নিয়াজী, রাব্বানী, আতীশ, মওলবী হাবীবুর রহমানও ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সাইয়াফ ও রাব্বানী। ১৯৬৯ সালে কমিউনিজমবিরোধী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা "জওয়ানানে-মুসলমান" নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন আবদুর রহীম নিয়াজী। ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র গুলবদন হিকমতইয়ার মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন, মুসলমান ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে হিকমতইয়ার সবার আগে থাকেন। ১৯৭২ সালে হিকমতইয়ার দেড় বছরের জন্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ছাত্রদের হাতে গড়া সংগঠনটি এবার

'জওয়ানানে-মুসলমান' নাম পরিবর্তন করে 'জমিয়তে ইসলামী' নাম ধারণ করে। এ সংগঠন এখন আর শুধু ছাত্রদের নয়, আফগানিস্তানের তাওহীদী জনতার প্রাণপ্রিয় সংগঠন।

সংগঠনের নেতৃত্বে বুরহানুদ্দীন রাব্বানী ও সাইয়াফ। সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান। সামরিক কর্মকর্তা কারাবন্দী মুজাহিদ ইঞ্জিনিয়ার হিকমতইয়ার। অধ্যাপক মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজী হলেন সংগঠনের নেপথ্য নায়ক।

১৯৭৩ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র সংগঠন "ইত্তেহাদুল ইসলামী" বিজয়ী হয়। কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের শোচনীয় পরাজয়ের প্রেক্ষিতে কাবুলস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেনঃ "এ দেশের ভবিষ্যত ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর হাতে।" উল্লেখ্য যে, বিশ্ব জুড়ে ইসলামের শত্রুরা সব রকমের ইসলামী আন্দোলনকেই চলতি শতকের বিখ্যাত সংগঠন মিসরের ইখওয়ানেরই শাখা মনে করে থাকে।

১৯৭৩-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের হুকুমে দাউদ শাহ্ আফগানিস্তান হতে ইসলামী আন্দোলনকে চিরতরে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালায়। এর মাস ছয়েক পর হিকমতইয়ার কারামুক্ত হন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি সশস্ত্র বাহিনীর ইসলামপ্রিয় সদস্যদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে তাদের প্রতি ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত পেশ করেন। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ বহু সৈন্য, বিশেষতঃ বিমানবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর ট্যাংক ডিভিশনের লোকেরা নাস্তিকতাবাদী পশুশক্তির মুকাবিলায় জান দিতে প্রস্তুত হন। "ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করার পক্ষের শক্তি দাউদ সমর্থিত শক্তির চেয়ে বেশি মজবুত"–এ কথা বুঝতে পেরে হিকমতইয়ার বেশ ক'টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেও কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট গাদ্দারের কারণে ব্যর্থ হয়ে পেশোয়ার পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অধ্যাপক রাব্বানীও তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। বাদশাহ্ দাউদের লোকেরা মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজী ও মাওলানা আবদু রাব্বির রাসুল সাইয়াফকে বন্দী করে।

ইসলামী আন্দোলনের দুই সৈনিক পাকিস্তানের পেশোয়ারে বসে সংগঠনকে শক্তিশালী করে একটি মজলিসে শুরা গঠন করেন। অধ্যাপক রাব্বানীকে সভাপতি করে এ প্রবাসী সংগঠন বাদশাহ্ দাউদ ও তার ছত্রছায়ায় পরিচালিত কমিউনিস্ট

ষড়যন্ত্রের শিকড় উপড়ে আল্লাহর আফগানে আল্লাহওয়ালাদের শাসন কায়েমের কর্মসূচী নেয়। সমাজের সচেতন মুসলমান নেতা, অধ্যাপক, প্রকৌশলী এবং উলামারা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম-বিরোধী শাসনব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর আইন কায়েমের সংগ্রামের তৈয়ারী করছেন, তখন সরকার এবং দেশ, ধর্ম ও জাতি বিরোধী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও কুচক্রী মহলের উৎপীড়নে দেশের মানুষ চরমভাবে উদ্বিগ্ন। ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের মাঝে তারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে আযাদীর জন্যে। ঈমান আমানের সুরক্ষার জন্যে আফগানিস্তানের শহর-বন্দর গাঁও-গেরামে চলছে দোআ আর কান্নাকাটি। মসজিদে দোআ হচ্ছে। মাদ্রাসাগুলোতে চলছে খতম। খেতের আইলে সিজদায় লুটিয়ে পড়া কিষান কাঁদছে। ঘরের কোণে হাত তুলে মুনাজাত করছেন মা-বোন ও মেয়েরা। আল্লাহ, তুমি কমিউনিস্ট হায়েনাদের হাত হতে আমাদের আদরের দেশটাকে রক্ষা কর। আল্লাহ, আমাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, কুরআন-কিতাব, মান-সম্মান সব কিছুর হিফাযত কর! ইসলাম কায়েমের জন্যে যারা সংগ্রাম করছে তাদের তুমি সাহায্য কর, সফল কর!

জিহাদ করে বাঁচতে চাই

সরকারের কাঁধে সওয়ার কমিউনিস্টদের মুকাবিলা তথ্য-প্রচারণা ও রাজনৈতিকভাবে করার পক্ষপাতী ছিলেন রাব্বানী। ছাত্র-জীবন থেকেই তিনি নিয়মানুবর্তী মানুষ। প্রয়োজনে কিছু হত্যা সংঘটিত করে এবং সামরিক ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার ভেতর দিয়েই মোটামুটিভাবে আন্দোলনের গতি এগিয়ে নেয়া ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু গুলবদন হিকমতইয়ারের মত ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। সংগঠনের জযবাওয়ালা সদস্যদের মতামতও প্রত্যক্ষ জিহাদের পক্ষে। সুতরাং এটাই সিদ্ধান্ত।

আফগানিস্তানের পানশিরে সর্বপ্রথম জিহাদী কাফেলা কদম রাখলো। পানশির অবরোধ করার সময় সরকারী সৈন্যদের হাতে বহুসংখ্যক যুবক গ্রেফতার হওয়া ছাড়াও বেশ ক'জন শহীদ হলেন। তন্মধ্যে ডঃ মুহাম্মদ উমর, সাইফুদ্দীন এবং মাওলানা হাবীবুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

পেশোয়ারে আয়োজিত সংগঠনের 'মজলিসে শুরা'র পরবর্তী বৈঠকে বুরহানুদ্দীন রাব্বানী এসমস্ত মৃত্যু ও গ্রেফতারীর জন্যে হিকমতইয়ারকে দায়ী

করেন। রাব্বানী পুনরায় যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব করলে পর পর কয়েকটি সভায় উপস্থিত কর্মীরা যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষেই রায় দেন। শেষ পর্যন্ত তারা অধ্যাপক রাব্বানীকে বাদ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হিকমতইয়ারকে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত করেন এবং সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে "আল-হিযবুল ইসলামী" রাখা হয়। এসময় আফগানিস্তান-এর বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী এবং নসরুল্লাহ মনসূর উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন পর কাজী মুহাম্মদ আমীন সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হলে রাব্বানী ও হিকমতইয়ার তাঁর নেতৃত্বে কাজ করে যান। উল্লেখ্য যে, রাব্বানী ও হিকমতইয়ারের মধ্যকার পার্থক্য নীতি-আদর্শ বা লক্ষ্যের নয়; বরং এ পার্থক্য পলিসি ও কর্মপন্থার। বর্তমানেও তাঁরা আফগানিস্তানে ভিন্নধর্মী দুটো পলিসির কর্ণধার।

হিকমতইয়ার একদল যুবককে নিয়ে বড় বড় নাস্তিক, মুরতাদ ও কাফের হত্যার কাজ চালাতে থাকেন। এক সুযোগে তাঁর যুবক বাহিনী পুলিশ একাডেমীর বিশিষ্ট কমিউনিস্ট প্রফেসর মীর আকবর খাইবরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সে বিভিন্ন সময় আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতো বলে উলামায়ে কেরামের মতে মৃত্যুদণ্ডই ছিল তার সাজা। এদিকে আফগানিস্তানের ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়া বাদশাহ্ দাউদকে উপর্যুপরি চাপ দিতে থাকে। কিন্তু দাউদ ভালো করেই জানে যে, ইসলামের সৈনিকদের দাবিয়ে রাখা যায় না—আজীবন মদীনার সাথে সম্পৃক্ত জনতাকে ডাণ্ডা মেরে মস্কোর দিকে ফেরানো যাবে না। সুতরাং দাউদ কমিউনিস্টদের হাত হতে রেহাই পাওয়ার চিন্তা করতে লাগলো। কেননা, মৌলবাদীরা তার প্রতি দারুণ চটে গিয়েছে। এদের রোষ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

জেনারেল দাউদের ১৯৭৩ হতে ২৭শে এপ্রিল ৭৮-এর শাসনামলে ছয় শ'য়ের মতো টগবগে মুসলিম নওজোয়ান প্রাণ দিলো। ইঞ্জিনিয়ার মাওলানা হাবীবুর রহমান এঁদের অন্যতম। কিন্তু ছয় শত মানুষের রক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্তভৃষ্ণা মিটাতে পারলো না। আরও বেশি সংখ্যক মুসলিম তরুণের খুন তাদের চাই। সুতরাং আফগানিস্তানের দেশী কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়ন দাউদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান-এর পরিকল্পনা করলো। কারণ, কমিউনিজমের ভিত মজবুত করতে যে পরিমাণ রক্ত ঢালতে হয়, জেনারেল দাউদকে দিয়ে তা হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র দাউদের উপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করতে শুরু করলো। এদিকে দাউদ তার বিরুদ্ধে রচিত অভ্যুত্থানের নীল-নক্শার সন্ধান পেয়ে বেসামরিক কমিউনিস্টদের ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নীরব রইলো। কেননা, পার্টির ছেলেদের নাখোশ করলে তারাই তাদের নেতাকে ধোলাই দিয়ে গদিছাড়া করে। আদর্শহীন রাজনীতির এটাই নিয়ম। আর এ ভুলের মাশুল হিসেবেই প্রাণ দিতে হলো বাদশাহ্ দাউদকে।

রক্তাক্ত সিংহাসন

এপ্রিল '৭৮-এ দাউদের উপদেষ্টা নূর মোহাম্মদ তারাকী দাউদকে তার গোটা পরিবারসহ হত্যা করে ক্ষমতায় এলো এবং জনসাধারণের প্রদর্শনের উদ্দেশে দাউদের 'রক্তাক্ত সিংহাসন' জনসমক্ষে রেখে দিলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার পদলেহী দেশীয় কমিউনিস্টদের পছন্দসই ব্যক্তি 'তারাকী' ক্ষমতালাভের প্রথম দিকেই পনেরো হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। মুসলিম মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু শরীয়তবিরোধী আইন সে পাস করে। রেডিও-টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে এবং বেশ কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হতে ইসলামী সাবজেক্টগুলো বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে কমিউনিজম ও মার্কসবাদের বই-পত্র পাঠ্য করে। এছাড়া তারাকী আফগানিস্তানের মুসলিম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল কৃষক-শ্রমিক ও পেশাজীবী মানুষের উপর "সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক" কর্মশালায় যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক করে দেয়।

অগ্নিঝরা ফত্ওয়া

অতি অল্প সময়ের ভেতর রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সমস্ত আফগান জনতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রতিটি অঞ্চলের আলম সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে তারাকীকে "কাফের" আখ্যায়িত করে ফত্ওয়া প্রদান করেন। আফগান তাওহীদী জনতা তাদের একান্ত কাছের মানুষ উলামায়ে কেরামের 'ফত্ওয়া' পেয়ে চরমভাবে আবেগ-উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। এতদিনের কেন্দ্রীয় ইসলামী আন্দোলন, পোস্টার-লিফলেট, প্যাড-ডাইরী, সভা-সেমিনার হতে সম্প্রসারিত হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণ-মানুষের হৃদয়ে আসন করে নেয়। 'ফত্ওয়া' প্রচারের ক'দিন পরই জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার জনতা 'হিরাত' শহরটি অবরোধ

করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং শহরের বুকে তাওহীদী পতাকা উত্তোলনের পর লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশবরেণ্য উলামা ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা সোভিয়েত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, দেশীয় কমিউনিস্টদের তৎপরতা ও সরকারের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আফগান জনগণের সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অগ্নিঝরা বক্তব্য রাখেন।

'হিরাত' শহর নিয়ন্ত্রণের আনন্দ, সরকারের ইসলাম বিরোধী শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত এবং ইসলামী জিহাদের জন্যে প্রস্তুতিতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে হামলা করার জন্যে তারাকী তার সৈন্য ও বিমানবাহিনী পাঠায়। রাশিয়ার কমিউনিস্ট খুনীদের ইচ্ছে পূরণে তারাকীর জল্লাদবাহিনী রকেট ও বোমা হামলায় প্রায় ত্রিশ হাজার আফগানকে সে দিন শহীদ করে দেয়। হিরাত শহরের পৈশাচিক গণ-হত্যার আগুন সারা আফগানিস্তানে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আল-হিয্‌বুল ইসলামী কর্মীদের পাশে তখন লাখো জনতার সশস্ত্র জোয়ার। সেনাবাহিনীর বেশ কিছু মর্দে-মুজাহিদ সরকারপক্ষ ত্যাগ করে গণ-বাহিনীতে যোগ দেন। তন্মধ্যে–যাবিল, আসমার ও নহরাইন সেক্টরের সৈনিকেরা উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহের অবস্থা দেখে তারাকীর মাথায় খুন চেপে যায়। সে পাগলা কুকুরের মতো হয়ে পড়ে। আফগানী মুমিন জনগণকে পাইকারীভাবে হত্যার জন্যে গ্রামের পর গ্রাম, বস্তির পর বস্তি জ্বালিয়ে দেয়। 'কারহালা' নামক একটি গ্রামেই ১১১৬ জন সক্ষম যুবা-তরুণকে জমা করে হত্যা করা হয়।

কমিউনিস্ট সরকারের সাথে মুসলিম জনতার লড়াই চলছে তো চলছেই। ইসলামী প্রকৃতি ও স্বভাবের আফগান জনগণ তাদের ঐতিহ্যবাহী পৌরুষ, সুখ্যাত বীরত্ব কাজে লাগানোর মহা সুযোগ পেয়ে যেন টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু অসংগঠিত, নিরস্ত্র, প্রশিক্ষণহীন একটি দল কি করে একটি নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর মুকাবিলা করবে? এছাড়া দেশের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুবকদের অনেকেই আবার স্বদেশ-স্বজাতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের হয়ে অস্ত্র ধরেছে। মুসলমান নামধারী সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তখন খোদ কাফেরের পতাকাতলে সমবেত। সুতরাং তারাকীর শাসনামলে দেশীয় কমিউনিস্টদের হাতেই দুই লক্ষ ঈমানদার শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা

তারাকীর আমলে সামরিক শক্তির একক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হাফীজুল্লাহ আমীন। দাউদ হত্যার ব্যাপারে তার হাত ছিল সর্বাধিক। আফগানী কমিউনিস্ট দলসমূহের একটির নাম 'খাল্‌ক' অপরটির নাম 'পারচাম'। তারাকী-আমীন খাল্‌কের নেতা আর পারচামের নেতা বাবরাক কারমাল। আমীন-তারাকীর সময় বাবরাক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাগে নির্বাসন-জীবন কাটাচ্ছিলো। অতঃপর ১৯৭ তে সে মস্কো চলে যায়। '৭৯ তে হাভানায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে 'তারাকী' মস্কো হয়ে হাভানা যায়। তখন ব্রেজনেভ তারাকীকে বলেন কারমালকে দেশে নিয়ে যেতে, কিন্তু তারাকী আপত্তি জানিয়ে বলে যে, আমীন তাকে গ্রহণ করবে না। ব্যাস্ আর যায় কই? এবার আমীনের পালা। কারণ, কমিউনিজমে মানুষের মূল্য নেই। বিশ্বাসের মূল্য নেই। মূল্য নেই ত্যাগের। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে কমিউনিস্টরা এস্তেন্‌জায় ব্যবহৃত ঢিলার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয় বহু দিনের বিশ্বস্ত মানুষটাকে। দাউদ-আমীন-তারাকী-কারমালদের পরিণতিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তারাকী হাভানা থেকে দেশে ফিরলে বিমান বন্দরে তার প্রধানমন্ত্রী হাফীজুল্লাহ আমীন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে যান। ভাগ্য ভালো, এয়ারপোর্টেই আমীনকে গুলি করে কুকুরের মতো মারেনি সোভিয়েতের আজ্ঞাবহ কমিউনিস্টরা। কাবুলে গিয়ে তারাকী ও রাশিয়ান এমব্যাসাডর লোক প্রেরণ করে আমীনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে, কিন্তু ঘাতকরা গুলি করলেও ভাগ্যিস আমীন বেঁচে যায় এবং '৭৯-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া আমীনই তারাকীকে বন্দী করে নাস্তিকদের শেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়, যেখানে মুসলমান নামধারী জাতীয় গাদ্দার, খোদাদ্রোহী-নাস্তিক, কমিউনিস্টদের জন্যে অপেক্ষা করছে বিচিত্র ধরনের সব আযাব।

রাখে আল্লাহ মারে কে?

আফগান মুসলমানরা কমিউনিস্টদের নৃশংস হামলায় নিহত ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা জানতে চাইলে 'আমীন সরকার' একটি শ্বেত-পত্র প্রকাশ করে। এতে মাত্র বার হাজার মানুষের নাম প্রকাশিত হয় এ তারাকী শাসনের সমালোচনাও করা হয়। নিহতদের তালিকার ছত্রিশ নাম্বার নামটি ছিল আবদু রাব্বির রাসূল

সাইয়াফের। কমিউনিস্ট সরকারের ধারণা অনুযায়ী সাইয়াফ ছিলেন মৃত। পোল চারখী জেলের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে সাইয়াফের নামও ছিল। আল্লাহর কুদরতে আফগান জিহাদের মহান নেতা মাওলানা সাইয়াফ সেদিন বেঁচে যান।

Poll charkhy জেলে ইসলামপন্থী ১১৭ জন যুবককে ফাঁসীর হুকুম শোনাতে গেলে তারা জেলের কর্মকর্তা ও প্রহরীদের উপর চড়াও হয়। তখন ফাঁসীর মঞ্চের যাত্রীদের উপর গুলি করেই কমিউনিস্টরা কাজ শেষ করে। ইসলামপন্থী বন্দীদেরও কমিউনিস্টরা মারাত্মক ভয় পায়। মুক্ত থাকলে তো কথাই নেই। অতএব, যত দ্রুত এদের প্রাণ কেড়ে নেয়া যায় ততই মঙ্গল। একশ' সতের জন জওয়ান মুজাহিদ শাহাদাতের পিয়ালায় চুমুক দিলেও মাওলানা সাইয়াফ তখন অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। কারণ, তিনি ছিলেন অন্য সেলে। নেতা হিসেবে তাঁকে আলাদাভাবে রাখা হতো। সুতরাং সাইয়াফ বাস্তব জগতে বেঁচে থাকলেও সরকারের খাতায় তিনি নিহত। রাখে আল্লাহ মারে কে?

লাল পতাকার খোয়াব

হাফীজুল্লাহ আমীনের শাসনের তিন মাস সময় পর্যন্ত বিদ্রোহী জনতার অবিরত সংগ্রাম চলতেই থাকলো। এতদিনে রাশিয়া ভালোভাবেই বুঝেছে যে, মুসলমান ঘরে জন্ম নেয়া নকল কমিউনিস্টদের মাধ্যমে তাদের সুখের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। তাই দাউদ-তারাকী-আমীন গংকে দিয়ে মোটামুটি রাস্তা পরিষ্কার করিয়ে এবার তারা খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত, সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনী দিয়ে আফগানিস্তানের মাটিকে তুলো ধুনো করে দেবে। ইসলামী বিশ্বাস, মদীনার মহব্বত, কুরআনের আযমত, আল্লাহর রহমত বুকে নিয়ে যে সরল-সোজা আল্লাহওয়ালা জাতিটি সুখে-শান্তিতে নিজেদের স্বাধীন দেশ-মাতৃকায় বসবাস করছে, সে জাতির বুকে লাথি মেরে, এদের ঈমান-আকীদা, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মাটি চাপা দিয়ে উড়াতে হবে হাতুড়ি-কাস্তে মার্কা লাল পতাকা। যেভাবে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে তারা কেড়ে নিয়েছিল মধ্য এশিয়ার বিরাট বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো। কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান এবং কিরঘিজ রাজ্যের ঐতিহাসিক তাশকন্দ, বোখারা, সমরকন্দ, শাশ, ফারগানা, মুরগেনানসহ শত শত এলম ও

হিকমতের কেন্দ্রে চালিয়েছিলো পশুবাদের দুর্দান্ত তাণ্ডব। ঠিক তেমনি কাবু, হিরাত, কান্দাহার, কন্দুজ, মাজার-এ শরীফ এবং জালালাবাদও তারা নিয়ে যাবে। এরপর পাকিস্তানের পেশোয়ার, ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচী হয়ে সোজা ওমান সাগরে। বিশ্বের বৃহত্তম তেলক্ষেত্রগুলো, মুসলিম বিশ্বের নাড়ি হরমুজ প্রণালীর বিলকুল কাছে। এরপর পশ্চিমে ইরান-ইরাক উপসাগর হয়ে মুসলিম জাতির হৃৎপিণ্ড মক্কা-মদীনা। আর পূর্বে পুরানো তাবেদার ভারত-বার্মা চক্রের কাঁধে বন্দুক রেখে বাংলাদেশ। কি চমৎকার পরিকল্পনা! রোদের মতো স্পষ্ট বিজয়।

কিন্তু আফগানিস্তানে যে বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে এতো মূল্য চুকাতে হবে, তা যদি তারা জানতো! হায়! শক্তির অহমিকায় অন্ধ মানুষগুলো যদি একটু ভাবতো যে, আল্লাহ একজন আছেন। জয়-পরাজয়ের ফয়সালা যমীনে নয়, বরং আসমানেই হয়!! দরিদ্র একটি দেশের অশিক্ষিত জনগণ–মোল্লা-মওলবী, ইমাম-মুয়াজ্জিন, কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী মেহনতী জনগণ-আর গুটিকতেক উচ্চশিক্ষিত মানুষের ভাঙ্গা বন্দুক, কাটা রাইফেল, পাহাড়ের গুহার কামারখানায় তৈরি পিস্তল-ছুরি-চাকু ও গেরস্থের গরুমারা লাঠির মুকাবিলায় বিশ্বের সর্বসাম্প্রতিক মডেলের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত রুশ-বাহিনী দীর্ঘ প্রায় দশটি বছর মার খেতে খেতে পঙ্গু হয়ে বাড়ী ফিরে গেলো সীমাহীন সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান-হেলিকপ্টার-ট্যাংক-সাঁজোয়া গাড়ী-রসদসম্ভার এবং অগণিত সৈন্যের প্রাণ হারিয়ে। রাশিয়ার নেতা মিখাইল গরবাচেভ বলতে বাধ্য হলেন, “আমরা আফগানিস্তানে হামলা করে ভুল করেছি।” এরপরও কি বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে, শক্তির দম্ভ চূর্ণ হতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। ‘আল্লাহু আকবার’-এর চেয়ে বড় সুপ্রীম পাওয়ার আর কিছু হতে পারে না। এ চিরন্তন সত্যই আজ বিশ্ব-মানবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়গাথা। আরবের খেজুর তলার লোকদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়াভিযান।

ব্যবহৃত টয়লেট পেপার

আফগানিস্তান দখলের প্রস্তুতি নিয়ে সোভিয়েত বাহিনী সীমান্তে জড়ো হচ্ছে। আমীন এ খবর পেয়ে রুশ সৈন্যদের প্রবেশের সপ্তাহকাল পূর্বেই প্রতিবেশী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার উদ্দেশে যোগাযোগ করলো। সে

দেখতে পেলো যে, তারও সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে-ও ব্যবহৃত টয়লেট পেপারের মতো নিক্ষিপ্ত হবে পায়খানার কমোডে। যাদের দড়ির টানে নেচেছে আমীন, ওরাই আজ তাকে না জানিয়ে আফগানিস্তানে সৈন্য পরিচালনা করছে। কিন্তু ভাগ্য তার খারাপ, পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগের আগেই সোভিয়েত সৈন্যরা মাত্র আধা দিনের ভেতর গোটা আফগানিস্তান দখল করে নেয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নতুন লোককে ক্ষমতায় বসালেন। নাম তার বাবরাক কারমাল। রুশ সৈন্যদের দেশ দখলের দুই দিন পর একটি হেলিকপ্টার গানশীপে করে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের পালা গুণ্ডা কারমাল মস্কো হতে কাবুলে এলো। তার সর্বপ্রথম বেতার ভাষণ মস্কো ও কাবুল বেতার হতে একযোগে প্রচারিত হয়। ওরা তখন আফগানিস্তানকে সোভিয়েতের অংশ মনে করতে শুরু করে।

মাথার মূল্য দেড় কোটি টাকা

বাবরাক কারমাল গদিতে বসেই জেলের তালা খুলে দিল। এতে তার 'পারচাম' পার্টির কমরেডরা বেরুলো, তারাকী ও আমীন যাদের আটক করেছিল। নতুন শাসকের পার্টির ছেলেরা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো মুক্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো : এ জোয়ারের টানে বেরুলেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নিহত নেতা সাইয়াফ। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁকে নতুন জীবন দিয়ে যে বিরাট কাজ নিয়েছেন তা বর্ণনাতীত। আফগান সমস্যা আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন ও সারা ইসলামী দুনিয়ায় মুজাহিদদের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সাইয়াফের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। গোটা মুজাহিদ বাহিনীর সফল সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর বিপ্লবী কর্মতৎপরতার ভয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সকল তাগুত থর থর করে কাঁপতো। আবদু রাব্বির রাসূল সাইয়াফ যেন একাই এক লাখ। তাই কারমাল সরকার ঘোষণা দিয়েছিলঃ "যে ব্যক্তি সাইয়াফকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় এনে দিতে পারবে, তাকে কমিউনিস্ট সরকারের তরফ থেকে পনের মিলিয়ন (দেড় কোটি) আফগানী টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।"

বিশ্বের সব তাগুতী পরাশক্তির কবর রচনার জন্যে আল্লাহপাক যাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন, তাঁর মাথা কি দেড় কোটি টাকায় কেনা যায়? পুরস্কার ঘোষণা হওয়ায় সৈন্যরা বারোটি ট্যাংক নিয়ে তাঁর বাড়ীতে চড়াও হয়, কিন্তু সাইয়াফ তখন জিহাদের ময়দানে।

পাশবিকতার দাস্তান

১৯৭৯-এর ২৭শে ডিসেম্বরের কালো রাতটি যখন পোহালো, তখন আফগানিস্তানের ধর্মপ্রাণ মানুষ যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলো, তা তারা কোনদিন ভুলতে পারবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বজাধারী দেশীয় মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট ছাত্র-যুবক ও সরকারী সৈন্যবাহিনীর পাশবিকতা তারা বহু দেখেছে, কিন্তু খাস রাশিয়ান সৈন্যদের 'লাল অভিযান' তারা এই প্রথম দেখলো। আগে তারা কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে ইসলামী আন্দোলনের লোকজন বা আলেম-উলামাদের মুখে যা শুনতো, এ সব কিছুকেই হার মানিয়েছে এই শ্বেত ভল্লুকের দল। এদের নৃশংসতার কোন নজির নেই; নেই ভাষায় প্রকাশের শক্তি।

ইসলামপ্রিয় আফগান মুসলমান জনসাধারণ যখন তাদের নিজ চোখে দেখলো যে, তাদের গ্রামের মসজিদে সোভিয়েত সৈন্যরা পায়খানা করছে আর সেই নষ্ট মসজিদের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে পাক কুরআনের ছেঁড়া পাতা। তখন তাদের কলজে ফেটে গিয়েছে, হৃদয়ে হয়েছে রক্তক্ষরণ। কাবুল-হিরাত-কন্দুজ-জালালাবাদ-মাজার শরীফসহ বড় শহরের রাজপথে মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার মাওলানা, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কর্মীদের জীপের পেছনে বেঁধে টানা-হেঁচড়া করছে। তারা জ্বালিয়ে খাক করে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। হত্যা, লুণ্ঠন, নিপীড়ন, নারী নির্যাতনে গোটা দেশটাকে একটা বিশাল পশু-রাজত্বে পরিণত করেছে রুশ বাহিনীর নাস্তিক সৈন্যরা।

অবশ্য আগে তারা বড় বড় জ্ঞানীদের মুখে শুনতো যে, নাস্তিকেরা নাকি সব সময়ই যে কোন আস্তিকের চেয়ে ভালো। আফগানিস্তানের বেঁচে থাকা মানুষ এসব বাস্তব অবস্থা দেখে ঘরে বসে থাকেনি। যথাসম্ভব প্রতিরোধ গড়ে তুলে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে কাফেরের হাতে। নারী বিলিয়েছে তার সতীত্ব-সম্পদ। লাখো লাখো মুসলমানের লাশ পেছনে ফেলে, লক্ষ আফগান আবাল-বৃদ্ধবনিতার কাফেলা শহর, নগর, গ্রাম, বন্দর ছেড়ে পাহাড়-পর্বত, দুর্গম-গিরি পেরিয়ে এসে আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী পাকিস্তান ও ইরানে। ষাট লক্ষ মানুষ ঘর-বাড়ী ভিটে-মাটি ছেড়ে হিজরত করলো অন্য দেশে। রুগ্ন-অথর্ব মহিলা-বৃদ্ধ ও শিশুরা ছাড়া সকল সক্ষম আফগান-যুবা-তরুণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব নির্বিশেষে যোগ দিলো ঈমান বাঁচানোর জিহাদে, জীবন বাঁচানোর জিহাদে।

অগ্নি পরীক্ষা

রুশ সৈন্যরা একটি পাহাড়ী গ্রামে গিয়ে আক্রমণ করলো। গাঁয়ের সব পুরুষ তখন ওত পেতে আছে ভাঙ্গা-চোরা হাতিয়ার নিয়ে, কিন্তু না, সৈন্যরা গ্রামের বাইরে আসছেই না। একটু পর তারা দেখতে পেলো, গাঁয়ের সব যুবতী মেয়েদের নিয়ে সৈন্যরা হেলিকপ্টারে করে চলে যাচ্ছে। হায় হায় করে উঠলো এরা। পুরুষদের খুঁজে না পেয়ে রুশ ভালুকেরা মেয়েদের নিয়ে গেলো। নিচ থেকে গুলি করেও কোন ফায়দা হলো না। কিছুক্ষণ পর হেলিকপ্টারগুলো ফিরে এলো। গ্রামটির বরাবর এসেই সেগুলো মানুষ ফেলতে লাগলো। রুশ সৈন্যদের পাশবিকতার শিকা–রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, থেঁতলে যাওয়া নারীদেহ মাটিতে পড়তেই গাঁয়ের লোকেরা এসে জড়ো হলো সেগুলোর কাছে দেখতে পেলো এই গ্রামের উর্বশী তরুণীদের অনাবৃত শরীর, যাদের একটু আগে ধরে নিয়েছিল হানাদার হায়েনারা। পাশবিক নির্যাতনের অসহায় শিকার আড়াই শত খাদিজা-রোকেয়া, ফাতিমা-যোহরা আর নাবিলা এখন শহীদা হয়ে গেছে। শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে যাওয়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও আত্মীয়রা যখন খণ্ড-বিখণ্ড লাশগুলো কুড়িয়ে আনতে লাগলো, তখন উপর থেকে শুরু হলো মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার। তরুণীদের লাশের উপর লুটিয়ে পড়লো আরও, বহু তাজা শহীদ। রুশ বাহিনীর হাতে আফগান যুদ্ধে প্রায় বিশ লক্ষ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। এ পৈশাচিক হত্যা ও নারকীয় নির্যাতনের কাহিনীটি আমি নিজ কানে শুনেছি। আফগান জিহাদের রসদ বিষয়ক কর্মকর্তা, ফিলিস্তিনী নাগরিক জনাব তামীম আল-আদনানী চট্টগ্রামের এক জনসমাবেশে এ কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। অনুবাদক হিসেবে আমি তাঁর সাথে এ প্রোগ্রামে যোগ দেই।

আফগানিস্তানের গ্রামগুলোতে রাশিয়ার সৈন্যরা রাসায়নিক বোমা হামলা চালায়, যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছ-পালা ও পানি দূষিত হয়ে পড়ে। দূষিত পানি খেয়ে বহু স্কুল ছাত্র প্রাণ দেয়। মৃত্যুর তুহিন শীতল কোলে ঢলে পড়ে মক্তবের মাসুম শিশুরা। ফুলের মতো সুন্দর আর চাঁদের মতো ফুটফুটে আফগান শিশুরা তাদের বাড়ীর উঠোনে, স্কুলের মাঠে, মসজিদের আঙ্গিনায় দেখতে পেতো ছোট্ট ছোট্ট অনেক খেলনা। লাল, নীল, সবুজ, খয়েরী, হলুদ আর গোলাপী রংয়ের ফড়িং, ঘোড়া, হাঁস, ময়ূর ইত্যাদি। কিন্তু আসলে এগুলো খেলনা নয়, বোমা।

হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই বিস্ফোরিত হয়ে আশেপাশের অন্তত ৫০ গজ জায়গার সবকিছু ঝলসে যায়। রাতের বেলায় কমিউনিস্ট সেনা ও সোভিয়েত বাহিনীর সদস্যরা এগুলো ছড়িয়ে রেখে যায়। এসব কারণেই আজ আফগানিস্তানের প্রতি সাতটি শিশুর মাঝে একটি শিশু পঙ্গু বা আহত।

চির মুক্ত আফগান

হযরত আসেম বিন আমর আত-তামীমী কর্তৃক বিজিত, শতকরা নিরানব্বই জন মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটি হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে কালেমা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর মালা গলায় পরে, ইসলামী শরীয়তকে তার অলংকার হিসেবে বরণ করে দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত বুক ফুলিয়ে টিকে আছে। এ দেশের স্বাধীনতা একদিনের জন্যও কোন দুশমন ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ১৯৭৩ সালে দেশী কমিউনিস্ট জেনারেল দাউদের শাসনই প্রথম খোদাদ্রোহী শাসন।

এ দেশে মানুষের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি ছিলঃ "আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত সে-ই, যে বেশি খোদাভীরু, পরহেযগার।" দেশের ত্যাগী উলামাদের প্রতি অসাধারণ ভক্তি-বিশ্বাস আফগান জাতির। এঁদের কথাই পয়লা কথা-এঁদের কথাই শেষ। দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ বছরের জিহাদেও উলামাদের কমান্ডেই লড়াই করছে আফগান মুসলিম বীরেরা।

অতীতেও কোন সময় আফগানিস্তানের নেকবখ্‌ত জনসাধারণ কোন গাদ্দার শাসককে ক্ষমা করেনি। আল্লাহ-নবীর হুকুমের খেলাফ কোন কাজ করলে দেশের বাদশাহকেও তারা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে নির্দ্বিধায়। ১৯১৯ সালে তাঁদের বাদশাহ হাবীবুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইংরেজ জানোয়ারদের সাথে আঁতাত করেছিল। গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে গেছে তার লাশ।

১৯২৪ সালে আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যতা ও পশ্চিমা দুনিয়ার নগ্নতা-বেহায়াপনা আমদানি করার চেষ্টা করেছিল। বাদশাহর স্ত্রী-কন্যারা বে-শরমের মতো চলাফেরা করতো। আফগান তাওহীদী জনতার সাহসী প্রতিরোধে আমানুল্লাহও আগের রাজার পথেই বিদায় হলো। ১৯২৮ সালে তার তখ্‌ত উল্টে দেয় দেশের সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী ও মোল্লা-মুসল্লীরা।

১৭৫৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সূর্য ডুবে যায়। পলাশীর আমবাগানে মুসলমানরা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়ে দু'শ' বছরের জন্যে গোলামীর

জিন্‌জির গলায় পরতে বাধ্য হয়। অতঃপর দীর্ঘ সংগ্রাম, সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে পাক-ভারত-বাংলা ১৯৪৭ সালে আযাদী লাভ করে, কিন্তু আফগানিস্তানে ইংরেজদের পতাকা উড়তে দেয়নি সে দেশের আল্লাহওয়ালা বাহাদুররা। ১৯৪২ সালে একবার ইংরেজরা যবরদস্ত হামলা করে বসলো, কিন্তু বৃটিশের বার হাজার সৈন্যই আফগানরা হজম করে ফেললো। মাত্র একজন সৈন্যই প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে রক্ষা পায়। সেই ভাগ্যবান খৃষ্টান সেনাটির নাম Dr. Pridon. যে ইংরেজের রাজ্যে সূর্য ডুবতো না, সে ইংরেজের চেরাগই আফগানিস্তানে জ্বলেনি। নীল-চোখওয়ালা সাহেবরা যে যমীনে টিকতে পারেনি সেখানে সাদা ভালুকেরা টিকবে কেমনে? কমিউনিস্টরা বড্ড ভুল জায়গায় পা দিয়েছিলো। সোভিয়েত নেতারা অংকে ভুল করে ফেলেছিলো। বিরাট ভুল।

সারা মুসলিম বিশ্ব খৃষ্টান মিশনারীদের দাবড়ানিতে হয়রান। ইংরেজদের ধর্ম প্রচারে পেরেশান। কিন্তু আফগানিস্তানের মাটিতে একটা গির্জা তো দূরের কথা, একজন মিশনারী খৃষ্টানও নেই। শহর বন্দর-গেরামে গিয়ে কেউ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বললে আফগান মুসলমানেরা তাকে কিলিয়ে ভূত বানিয়ে তবে ছাড়বে। সুতরাং কোন খৃষ্টান দেশই সে দেশে লোক পাঠাতে খুব একটা ভরসা পায় না। N.G.O ভিত্তিক তৎপরতা ও মানুষকে নানা উপায়ে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার মতো প্রতিষ্ঠানও সে দেশে অচল।

অতুলনীয় হাতিয়ার

আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে বলীয়ান, কুরআনের আলোকে আলোকিত, হাদীসের অলংকারে অলংকৃত, সাহাবা ও সালফে সালেহীনের রংয়ে রঞ্জিত, শহীদান ও মুজাহিদদের খুনরাঙ্গা আদর্শে উজ্জীবিত আফগানী মুসলমানরা দরিদ্র, অশিক্ষিত আর অর্থ-বাণিজ্য, সায়েন্স ও টেকনোলজীর দিক দিয়ে কমজোর হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত পৃথিবীকে আজ চ্যালেঞ্জ করছে। দুনিয়ার সকল পরাশক্তিকে দেখাচ্ছে বুড়ো আঙ্গুল। কারণ, তাদের হাতে রয়েছে একটা পরম শক্তিশালী হাতিয়ার–"ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহ্‌যানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুন্‌তুম মুমেনীন"–ঈমানের অস্ত্র।

চ্যালেঞ্জ করলাম

আফগানিস্তানের যে ভূখণ্ডটি পাক-চীন-রাশিয়া সীমান্তের মিলন কেন্দ্র; ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানের দিক দিয়ে এ স্থানটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। সেই "আন্-জামান" ভূখণ্ডটি ইসলামী সালতানাতের অংশ হলেও রাশিয়া সেটা জোর করে দখল করে এটম বোম বসিয়েছে।

সেই ছোট্ট অথচ মূল্যবান যমীনটিতে দেড়শ' মুজাহিদ তাদের নেতা নাজমুদ্দীনের নেতৃত্বে এমন উৎপাত শুরু করলো যে, সোভিয়েত সৈন্যরা ঘর হতে বেরুবার সাহস পায় না। নাজমুদ্দীনের নাগালের ভেতরে কোন ট্যাংকও নিরাপদে চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীটির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রাশিয়ান সেনারা হামলাই করে বসলো। নাজমুদ্দীন ও তাঁর দেড়শ' সাথী কমিউনিস্ট সেনাদের পরাজিত করে পাঁচ জন রুশ সামরিক অফিসারকে বন্দী করলেন। সোভিয়েত সরকার নাজমুদ্দীনের কাছে পত্র দিলোঃ "যা চাও, পাবে; আমাদের পাঁচ জন অফিসারকে ছেড়ে দাও।" নাজমুদ্দীন এক কথায় উত্তর লিখলেনঃ "আমরা ব্যবসায়ী নই।" অতঃপর সোভিয়েতেরা দ্বিতীয় পত্র দিলোঃ "যদি ওদের মুক্তি না দাও তাহলে গোটা এলাকা জ্বালিয়ে দিয়ে বুড়ো, জওয়ান ও শিশুসহ সব খতম করে দেয়া হবে।" আল্লাহর সৈনিক উত্তর দিলেনঃ "এই কমিউনিস্ট কুকুরেরা! তোরা তো কোন অঙ্গীকার বা সন্ধির তোয়াক্কা করিসনি।" অবশেষে কমিউনিস্ট রাশানরা রক্ত দিয়ে লেখা শেষ চিঠি পাঠালোঃ "যদি এ পাঁচ জনের কোন ক্ষতি হয় তবে আমরা এর বদলা নেব।" নাজমুদ্দীনও আখেরী জবাব পাঠালেনঃ "আমি এদের হত্যার আদেশ দিয়ে তোদের চ্যালেঞ্জ করলাম।"

পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়

বিগত কয়েক শতাব্দীতে মানব জাতি এমন লড়াই প্রত্যক্ষ করেনি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পরাশক্তির সাথে একটি গরীব দেশের শান্তিপ্রিয় জনতার অসম লড়াই। একদিকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, ট্যাংক, কামান-মিসাইল, বিমান-রকেট-মেশিনগান-গ্রেনেড, রাসায়নিক বোমা ও উন্নততর যোগাযোগ প্রক্রিয়া। আর অন্যদিকে হিমালয়ের মতো ঈমান, আটলান্টিকের মতো ধৈর্য, সাহারা মরুর মতো হিম্মত এবং আসমানের মতো তাওয়াক্কুল। না'রায়ে তাক্বীরের আওয়াজ এদের শক্তির উৎস, আশার আলো। দুনিয়ার মানুষ অবাক

তাকিয়ে রয়; "আশ্চর্য,এমনটি কী করে হয়?" কি করে যে এমনটি হয়, তা-ই বলছি। ঈমানের হাতিয়ার থাকলেই কি আর সবাই তা এস্তেমাল করতে পারে? অবশ্যই না। এ জন্যে প্রয়োজন বাড়তি যোগ্যতার।

আফগান মুজাহিদদের অবস্থা শুনলে বুঝে আসবে কেমন করে হয় এমন নুসরত আর মহা-বিজয়।

আলহাজ মোহাম্মদ উমর (পাঘমান)-এর নেতৃত্বে আট হাজার মুজাহিদ, মুহাম্মদ গুল (নাসেরাহ্)-এর নেতৃত্বাধীন বত্রিশ শ' মুজাহিদ, মুহাম্মদ খালেদ ফারুকীর কমান্ডে পনেরো হাজার জওয়ান, মওলবী হানীফের নেতৃত্বের আওতায় এগারো হাজার মুজাহিদ। এদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে, তাদের পরিচালনাধীন এমন কোন একজন মুজাহিদও নেই যিনি নামায পড়েন না। শতকরা নব্বই জন জামাতের পাবন্দী করেন। অধিকাংশই ওঠেন শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্যে। কেউ কেউ নফল রোযা মুখে নিয়ে লড়াই করেন। গান-বাদ্য-খেলা-মেলা বা পান-নেশা তো দূরের কথা, রেডিও পর্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া শোনেন না তারা। এবার বলুন, এরা কী না করতে পারে? কোন তাকত এমন আছে যা এদের সম্মুখে দাঁড়ায়? কোন্ অস্ত্র এমন আছে যা এদের গতিকে থামায়?

বাংলাদেশে মুজাহিদদের পদধূলি

বিশ্ব জুড়ে মুসলমানের মনে লুপ্ত জিহাদী চেতনার আগুনকে আবার সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখায় পরিণত করে সারা দুনিয়ার মজলুম মানুষের মুক্তির ঠিকানা তৈরির লক্ষ্যে, সকল প্রকার তাগুতী শক্তির কবর রচনা করে ইসলামের ঝাণ্ডাকে সর্বোচ্চে উড্ডীন করার মহান উদ্দেশে গঠিত হয়েছে পাকিস্তানভিত্তিক আফগান-জিহাদ সমর্থক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। তার নাম "হারকাত আল-জিহাদ আল-ইসলামী।" অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ইস্লামী জিহাদ আন্দোলন। এ সংগঠনের নেতা, বিশিষ্ট আলেম, মুজাহিদ জনাব সাইফুল্লাহ আখার একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছেন। '৮৮-এর শুরুর দিকে তিনি যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন দু'জন আরব বুদ্ধিজীবী। একজন মিসরীয় নাগরিক, ইখওয়ান নেতা শহীদ বান্নার বন্ধু ও সহকর্মী, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বর্তমানে কাতার সরকারের শরীয়ত বিষয়ক উপদেষ্টা, শায়খ আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার মিসরী। তিনি আফগান মুজাহিদদের জন্যে

আরব বিশ্বে তহবিল তৈরিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রায় আশি বছরের এ বৃদ্ধের মনে জিহাদের প্রেরণা ও জযবা দেখে আমাদের হৃদয়ের সাগরে ওঠে অক্ষমতা ও অবহেলাজনিত অনুশোচনার উত্তাল তরঙ্গ। আফসোসের পানিতে ভরে ওঠে দু'চোখ। অপরজন ফিলিস্তিনের একজন প্রাক্তন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা। আফগান জিহাদ চলাকালে দেশ-সমাজ-আত্মীয়-পরিজন, চাকরী-বাকরী ছেড়ে তিনি পেশোয়ারে বসবাস করেন। 'আফগান মুজাহিদদের খিদমত ও তাঁদের সার্বিক সেবা সরবরাহ' প্রতিষ্ঠানের তিনি পরিচালক। নাম তাঁর শায়খ তামীম আল-আদনানী।

এই তিন জন মেহমান ঢাকা-সিলেটসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের উলামা, মাশায়েখ, ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক, কর্মী তথা সর্বশ্রেণীর ইসলামপ্রিয় জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। তুলে ধরেন আফগান জিহাদের চিত্র। রুশ-কমিউনিস্ট বর্বরতার কাহিনী–মুজাহিদদের উপর খোদায়ী সাহায্যের দাস্তান।

রাতের বেলা ঢাকা থেকে টেলিফোন এলো যে, সকালে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে গাড়ী নিয়ে থাকতে হবে। আফগান নেতা তাঁর দুই সাথীসহ চাটগাঁ আসছেন। ক'জন সাথী-সঙ্গীসহ স্টেশন হতে মেহমানদের সাথে করে সোজা দেশের প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায়। আলোচনা সভা ও খানা-পিনাপর্ব শেষে সন্ধ্যায় গেলাম পটিয়াস্থ দেশের বৃহত্তর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়ায়। রাত্রে মাদ্রাসার রেস্ট হাউজে থেকে সকালবেলা ওখানকার ছাত্র-শিক্ষক ও সর্বস্তরের জনসাধারণের এক সমাবেশে মেহমানদের বক্তৃতার পর গাড়ীতে করে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে দারুল ম'আরিফ আল-ইসলামিয়া–সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে ছাত্র-গণজমায়েতে ভাষণদানের পর মেহমানদের নিয়ে যেতে হলো শহরের প্রাণকেন্দ্র লাল খান বাজারের মওলানা শওকত আলী রোড হয়ে পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জামেউল উলুম মাদ্রাসায়। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনের পেছনে, সুউচ্চ পাহাড়ের শীর্ষে চোখ জুড়ানো সুন্দর মসজিদটিতে আফগান-আরব মুজাহিদরা যখন তাদের চোখে দেখা, বুকে মাখা জিহাদ আর বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করছিলেন–খুলে বলছিলেন সোভিয়েত-আফগান কমিউনিস্ট হায়েনাদের নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের বিষাদপূর্ণ দাস্তান, তখন মসজিদে সমবেত

ছাত্র-যুবক, পুলিশ-সেপাই, কৃষক-শ্রমিক, চাকুরে-বেকার সকল স্তরের শ্রোতার হৃদয়-মনে উথলে উঠছিলো সমবেদনা আর সহমর্মিতার ছাত্র-ঊর্মিমালা। অশ্রুভেজা নয়নে উদ্ভাসিত হচ্ছিলো শপথের অগ্নিক্ষরা দ্যুতি। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তুফান তুলছিলো খালেদ-উমর, তারেক-মূসা, আইয়ূবী-মাহমুদ-ঈসা খাঁ ও তীতু মীরের শোণিতধারা। মুহুর্মুহু না'রায়ে তাকবীরের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হচ্ছিলো চারদিকের ছোট-বড় পাহাড়। দুলে উঠছিলো প্রাচ্যের রাণী চট্টলার মজবুত ঢালাই দেয়া ইমারত, পীচঢালা রাজপথ।

একাধিক অনুষ্ঠানে আরব অতিথি মুজাহিদদের দো-ভাষী হিসেবে শামিল হতে হয়েছে। বারকয়েক তাঁদের অগ্নিঝরা বক্তৃতার অনুবাদও আমাকে করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সেসব বক্তৃতায় বিবৃত কিছু অলৌকিক ঘটনার নিজ কানে শোনা বিবরণ সামনে উল্লেখ করবো সুধী পাঠকদের জন্যে। এতে রয়েছে ঈমান-পূর্ণ হৃদয়ের খোরাক, বিশ্বাসভরা মনের উপাদেয় খাদ্য।

এ বইয়ের জন্মকাহিনী

সময়ের স্বল্পতার দরুন মেহমানরা দ্রুত চলে যাওয়ায় অনেক শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই প্রোগ্রাম পায়নি। বিদায়ের দিন সকালে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের লাউঞ্জে আমাকে জড়িয়ে ধরে শায়খ আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার বললেনঃ বাবা! একটিবারের জন্যে হলেও ঘুরে এসো আল্লাহর সাহায্যের লীলাভূমি! দেখে এসো আফগানদের বিস্ময়কর সংগ্রাম!! হারকাত নেতা সাইফুল্লাহ আখতার শেষ মুআনাকার সময় বললেনঃ শুনেছি আপনি লেখালেখি করেন। আফগান জিহাদ নিয়েও কিছু লিখুন। একটা আতরের শিশি উপহার দিয়ে তিনি বললেনঃ আপনাকে আমি দু'টি কারণে মহব্বত করি। একে তো আপনি একজন চিন্তাশীল ও সংগ্রামী আলেমের সন্তান; আর দ্বিতীয়তঃ আপনার মাঝে আমি দেখতে পেয়েছি ইসলামী চিন্তা-চেতনার সুপ্ত প্রতিভা।

মুজাহিদ নেতার আবেগজড়িত কণ্ঠের কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। তখনি আমি মনে প্রতিজ্ঞা করি যে, আফগান জিহাদ ও মুজাহিদদের উপর অচিরেই কলম ধরবো ইনশাআল্লাহ্। মনের মাধুরী আর ঈমানের উত্তাপ মিশিয়ে লিখবো। সেই ইচ্ছের প্রেক্ষিতেই আজ এই বই। জিহাদপাগল এক মুজাহিদ নেতার উৎসাহেই এ বইটির জন্ম।

মেহমানদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের বোয়িংটি যখন আকাশে ডানা মেলেছে, তখন বিদায় দিতে যাওয়া লোকজন একে একে ফিরে চলেছে। গাড়ীতে বসে আমি শুধু ভাবছি কী করে লিখবো একটা বই? কেমনে যাবো আফগান রণাঙ্গনে? আল্লাহর তাওফীক ছাড়া তো আমার কোন সম্বলই নেই।

বিভিন্ন সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে ফিলিস্তিনী নাগরিক শায়খ তামীম আল-আদনানী যেসব বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র দু'তিনটে ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ

গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন হেফযখানায় কয়েকটি মাসুম বাচ্চা দুলে দুলে কুরআন মুখস্থ করছিলো। হৃদয়ের সুরক্ষিত ফলকে উৎকীর্ণ করছিলো কালামে-ইলাহীর একেকটি আয়াত। হঠাৎ করে এই গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ চালালো সোভিয়েত দখলদার, নাস্তিক, হায়ওয়ান, লাল-সেনারা। কাফের কমিউনিস্টদের একজন অফিসার গোছের লোক হেফযখানার বে-গুনাহ্ বাচ্চাদের হাত থেকে কুরআন শরীফ কেড়ে নিতে চাইলে নিষ্পাপ শিশুরা তাদের কুরআন শরীফ গিলাফে ভরে গলায় ঝুলিয়ে নেয়। আফগান মুসলমানের সাহসী সন্তানেরা এসব পশুর হাতে আল্লাহর পবিত্র কিতাব দিতে রাজী হয়নি। ইতিমধ্যে কয়েকজন রুশ অফিসার বাচ্চাদের ব্যবহারে রাগান্বিত হয়ে ওঠে এবং এ শিশুদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলির নির্দেশ দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত পাংশু চেহারার শিশুরা আল্লাহ....ও আল্লাহ........আল্লাহ......গো বলে আর্তনাদ করে ওঠে। তাদের চারপাশের বাড়ী-ঘর আগুনে জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে গ্রামবাসীর মরণ চিৎকার—করুণ কণ্ঠে বিলাপ করছে মা-বোন ও মেয়েরা। হাফেয শিশুদের উপর ফায়ার করা হলে এরা সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গ্রামটিতে কিয়ামত ঘটিয়ে যখন সোভিয়েত কুকুরগুলো চলে গেছে, তখন বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসীরা মসজিদের সামনে গিয়ে দেখতে পেলো, সবগুলো হাফেয শিশু শুয়ে শুয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পরিচিত মানুষদের দেখে তারা সবাই উঠে দাঁড়ালো। গ্রামবাসী তো অবাক, একটি শিশুও মরেনি বা আহত হয়নি। গুলি এদের বুকে বিদ্ধ হয়নি। দেখা গেলো, এদের বুকে ঝুলানো কুরআন শরীফের গিলাফের ভেতর কিছু বুলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে। সোনার টুকরো শিশুদের জীবিত পেয়ে তাদের বাবা-মা গাফুরুর রহীমের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।

নড়ে উঠলো শহীদের লাশ

বুড়ো বাবা-মার একমাত্র পুত্র আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে জিহাদে শরীক হয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের সাথে সম্মুখসমরে এই তরুণটি শহীদ হলে কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী শহীদের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে খবর দিলেন। আসতে যেতে পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করে শহীদের বুড়ো থুত্থুড়ে পিতা একমাত্র সন্তানের কবরের পাশে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই বৃদ্ধের দাবী হলো, তিনি তাঁর ছেলেকে দেখবেন। এছাড়া ছেলেটি তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা পেলো কিনা তা জানবেন। জয়ীফ বুড়োর আহাজারি আর করুণ আকুতির প্রেক্ষিতে কমান্ডার মাওলানা হাক্কানী শহীদের কবর খোঁড়ার অনুমতি দিলেন। দাফনের পাঁচ দিন পর যখন কবর খোলা হলো, জান্নাতী সুবাসের এক স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় তখন আশেপাশের মুজাহিদরা বিমোহিত হয়ে পড়লেন। প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই বুড়ো তাঁর নয়নমণির লাশ দেখে পাগলপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠলো; বাবা, তুই কি শহীদী মওত পেয়েছিস? আমি আর তোর মা কি এখন শহীদের বাবা-মা? নড়ে উঠলো শহীদের লাশ, মুখে উচ্চারিত হলো সালামঃ হ্যাঁ বাবা আপনাদের ছেলে একজন শহীদ। কথাটি বলেই একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুসাফাহা করলেন শহীদ তাঁর দুঃখী পিতার সাথে। দীর্ঘ পনেরো মিনিট এভাবেই করমর্দনরত ছিলেন শহীদ পুত্র আর তাঁর পিতা। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন বহুসংখ্যক মুজাহিদ। শহীদ পুত্রের কবর পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে শান্ত মনে ফিরে গেলেন বুড়ো। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর তৃপ্তির প্রবাহ। হৃদয় জুড়ে স্বর্গীয়-প্রশান্তির কোমল পরশ।

এক মুঠো বালি ও বন্দী হাফেয

অন্ধকার রাতে পথ ভুলে একজন হাফেযে কুরআন তরুণ মুজাহিদ সোভিয়েত সৈন্যদের ক্যাম্পে গিয়ে উঠলো। লম্বা জামা গায়ে, মাথায় টুপী–একজন লোককে দেখেই ক্যাম্পের সেন্ট্রিরা তাকে ধরে নিয়ে গেলো এক কর্নেলের তাঁবুতে। মুজাহিদদের গুপ্তচর ভেবে হাফেয ছেলেটিকে তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলো, কিন্তু পথহারা এই তরুণের কাছে তারা উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য না পেয়ে তার উপর নির্যাতন শুরু করলো। এক পর্যায়ে ক্যাম্পটির ইন-চার্জ রুশ কর্নেল এসে বললো, এই ছোকরা, শোন্! তোরা নাকি বালি বা কংকরে ফুঁ দিয়ে নিক্ষেপ করলে

তা বিস্ফোরিত হয়ে কমিউনিস্ট সৈন্যদের ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী, কামান ইত্যাদি পুড়ে যায়? যদি এটা সত্যি হয় তাহলে তোকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর না পারলে মৃত্যু। হাফেয ছেলেটি বহুবার এমন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছে, তবে কোনদিনই সে নিজে এমন করেনি। সীমাহীন শংকা ও দ্বিধা নিয়ে সে বললো, আমাকে একটু ওযুর পানি দিন। নামাযে দাঁড়িয়ে হাফেয ছেলেটি কেঁদে-কেটে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে দোআ করলোঃ আয় আল্লাহ্! তোমার দুশমনেরা কুরআনের শক্তি দেখতে চায়। দেখতে চায় ইসলামের সত্যতা। তোমার পথের সৈনিকদের কারামত নাস্তিকরা মানে না। তোমার কুদরত, কুরআনের শক্তি এবং ইসলামের সত্যতা তুমি প্রমাণ কর। আল্লাহ্ আমার প্রাণ নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই। তোমার দ্বীনের হুরমত, ইসলামের সৈনিকদের ইজ্জত নিয়ে আমি চিন্তা করছি। আয় খোদা! তুমি তোমার কুদরত দেখাও। ইসলামকে-জিহাদকে-আফগান জাতিকে, আমার বুকে লুকানো ত্রিশ পারা কালামকে তুমি শরমিন্দা করো না। সিজদা থেকে মাথা তুললো হাফেয তরুণটি, চোখে তার অশ্রুর বন্যা, মুখে একটি প্রভাময় বিশ্বাসের জান্নাতী দীপ্তি, ঠোঁটে উচ্চারিত হ—"ওমা রামাইতা....ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা।" বড় বড় রুশ সামরিক অফিসার, শত শত কমিউনিস্ট আর্মি উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে এই মর্দে ফকিরের দিকে—সামনের খোলা মাঠে আঠারটি ট্যাংক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো—হাতে একমুঠো বালি নিয়ে আল্লাহর নামে ছুঁড়ে মারলো অসহায় হাফেয ছেলেটি—বিস্ফোরিত হলো প্রতিটি বালিকণা—চুরমার হয়ে গেল সবগুলো ট্যাংক—দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো রুশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প—ভয়াল শব্দে কেঁপে উঠলো পাহাড়ী উপত্যকার পাথুরে মাটি। পরিস্থিতি দেখে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল কর্নেলসহ সমস্ত ব্যাটেলিয়ন। নাস্তিক সৈন্যরা আল্লাহর জাজ্বল্য সাহায্য ও শক্তি দেখে সোভিয়েতপক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিল আল্লাহওয়ালা মুজাহিদদের দলে। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে মুজাহিদ ক্যাম্পে ফিরে এলো পথহারা এই বন্দী হাফেয।

নাহিদঃ শহীদ এক আফগান কিশোরী

আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসকরা ক্ষমতা দখলের আগেই সর্দার দাউদ নারীমুক্তির নামে আফগান ধর্মপ্রাণ নারীদের মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান থেকে

বিচ্যুত করে লাম্পট্যের লেলিহান শিখার মধ্যে টেনে আনার পরিকল্পনা সমাপ্ত করেছিলেন। সর্দার দাউদের পূর্বসূরি আমানুল্লাহর আমলেও নারী স্বাধীনতার সস্তা শ্লোগান তুলে ইসলামী পর্দার বিধানকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করার হীন প্রয়াস চালানো হয়েছিলো। কিন্তু প্রতিটি ঘৃণ্য অপচেষ্টাই আফগান জনসাধারণের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দুর্জয় ইসলামী চেতনার সামনে টিকতে পারেনি। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে গেছে। শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনে এসে। এরপর যখন কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে বসলো, তখন ফ্রি-সেক্স-এর নামে সে দেশের যুবা-তরুণদের বিপথগামী করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন তাদের মহিলা আত্মীয়দের নিয়ে ক্লাবগুলোতে আসতে শুরু করলেন। রাস্তাঘাটে, শপিং সেন্টারে নারীদের অবাধ ও অসংযত চলাফেরা বৃদ্ধি পেলো। দেশীয় কমিউনিস্টরা নিজেদের আত্মীয় মহিলাদের ঘরের বাইরে বের করে এ কথাই বুঝাতে চাইতেন যে, আফগানিস্তানে এখন অবগুণ্ঠনবতী মহিলাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। অবরোধবাসিনী নারীসমাজ এবার মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে কমিউনিজমের বিস্তীর্ণ ভুবনে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নারী স্বাধীনতার চরম রূপ আফগানিস্তানের প্রগতিবাদী নাস্তিকরা দেখতে পেলো। তাদের মা, বোন, কুলবধূ ও কন্যারত্নরা কেবল রুশ দখলদার বাহিনী ও অধিকৃত আফগানিস্তানে সমাগত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের হাতে হাত রেখে ড্যান্সই করছে না; বরং রুশীয় মুরুব্বীদের বিছানায়ও তাদের যেতে হচ্ছে নিয়মিত। যখন তখন কেনা বাঁদীর মতো ব্যবহার করছে ওরা মুক্তমনা আফগান রমণীদের। আফগান কমিউনিস্টরা যেহেতু রুশীয় অতিথিদের সব ধরনের চাহিদা পূরণ করাকে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে, অতএব, সোভিয়েত অতিথিরাও খোলাখুলিভাবেই মদ ও নারীর প্রয়োজন তাদের আজ্ঞাবহ দালালদের কাছে তুলে ধরতে লাগলো। সোভিয়েত বাহিনী ও দেশীয় কমিউনিস্ট বরকন্দাজরা কেবল আফগানিস্তানের স্বাধীনতা বিক্রি করেই তৃপ্ত হয়নি; বরং আফগান রমণীদের ইজ্জত-সম্ভ্রমও তারা বিকিয়েছে নির্দ্বিধায়। আফগান কমিউনিস্ট পরিবারেও এমন কিছু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সচেতন মহিলা ছিলেন, যারা অন্যায় ও পাপাচারের এ উত্তাল সমুদ্রেও নিজেদের ঈমান ও মর্যাদা নিয়ে কঠিন পর্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়ে টিকে থেকেছেন। এমনি এক বোনের নাম নাহিদা। তাঁর পাষণ্ড কমিউনিস্ট পিতা

সোভিয়েত প্রভুদের হৃদয়-মন জয় করার উদ্দেশে তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলো। কিন্তু নাহিদ ওদের লাম্পট্যের আসরে আত্মাহুতি না দিয়ে পরিণত হয়েছে মুসলিম নারী জাতির জন্য পথপ্রদর্শক সুউচ্চ আলোর মিনারে। কিশোরী নাহিদের এ ঈমানদীপ্ত ঘটনা বিগত '৮৮-এর ২রা সেপ্টেম্বর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইসলামাবাদের ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক জনাব আসলাম সিরানী বর্ণনা করেছিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে আরও কিছু অজানা তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি, তবে আফগান সাংবাদিক গুলেস্পন খান পারভীন নামক আরেক তরুণীর কাহিনী শুনিয়েছেন, যা অনেকটা নাহিদেরই ঘটনার মতো।

ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায়

"নাহিদ" রাজধানী কাবুলের ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া বলখী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তাঁর বাবা ফরিদ খান ছিলেন কাবুলে কমিউনিস্ট পার্টির একজন উঁচু দরের পান্ডা। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ায় নাহিদ হয়ে উঠেছিল স্বভাবতই একটু ধর্মভীরু ও নম্র প্রকৃতির মেয়ে। তাছাড়া মেধাবী ছাত্রী হিসেবে তাঁর সুনাম সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে রূপ-সৌন্দর্যও দান করেছিলেন অন্য দশ জনের চেয়ে বেশি। পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার গুণে নাহিদের মনে দেশপ্রেম ও ধর্ম সচেতনতা ছোটবেলা থেকেই শিকড় গেড়ে বসে। মুক্ত স্বাধীন মুসলিম আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টদের শাসনক্ষমতা দখলে নাহিদের কোমল হৃদয় আহত হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তাঁর মনোভাব চেপে যেতে থাকেন। একজন কমিউনিস্ট নেতার কন্যা হওয়ার সুবাদে বাড়ীতে বসেই তিনি অনেক আগাম সংবাদ ও গোপন পরিকল্পনা জানার সুযোগ পেতেন। অতএব, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও ইজ্জতের লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের সাথে নাহিদ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অনেক গোপন তথ্য মুজাহিদদের আগাম জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আযাদীর লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি তাঁর স্কুলে সহপাঠিনীদের মাঝেও জিহাদের উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। নাহিদের মতো সচেতন ছাত্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টারই সুফল হিসেবে গোটা আফগান জিহাদে মুসলিম নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। কাবুলের রাবেয়া বলখী ও

সুরিয়া গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা যেদিন আফগান মুজাহিদদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গগনবিদারী শ্লোগান তুলে কাবুলের রাজপথে নেমেছিলো, সেদিনই দুশমনরা বুঝে গিয়েছিল যে, গোটা আফগানিস্তান এবার রাজপথে নামবে।

এ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই একদা রুশ দখলদার বাহিনী ও কারমাল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের লক্ষ্যে নিজেদের কালো ওড়না উড়িয়ে রাজপথে বের হয়ে এসেছিলো। রুশ বাহিনী এদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চালিয়েছিল নির্বিচারে। গুলিতে বেশ কিছু ছাত্রী হতাহত হয়। সে মিছিলের পুরোভাগে একটি আফগান কিশোরী পতাকা বহন করছিলো। সেনাবাহিনীর গুলিতে তার দুটো হাতই অচল হয়ে যাওয়ায় সে তার সহপাঠিনীর হাতে পতাকাটি তুলে দিয়ে বলেছিলঃ “এটা শক্ত করে ধর বোন। এ তো ইসলামের পতাকা, স্বদেশের আযাদীর পবিত্র ঝাণ্ডা এটা। একে কিছুতেই নিচে নামানো যায় না।” আযাদী ও সম্মানের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এসব ছাত্রীরা ছিল নাহিদের স্কুলেরই বান্ধবী।

নাহিদদের বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াতে আসতো সোভিয়েত সেনা অফিসারেরা। তাঁর বাবার সাথে উঁচু পর্যায়ের লোকদের ওঠাবসা-সখ্যতা। একদিন জনৈক রুশ কর্মকর্তা নাহিদদের বাড়ী এসে নাহিদকে এক নজর দেখে ফেলে। সাথে সাথে সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার মনে একটা কুমতলবের উদয় হয়। নাহিদের বাবা ফরিদ খানকে সে লোকটি বলেঃ তোমার মেয়ের নাচ দেখতে হবে ফরিদ খান। সেনা অফিসারটি মনে মনে ভাবতে থাকে, এতো খুবসুরত কন্যা ঘরে রেখে ফরিদ খান আমাদের সাথে বেঈমানী করছে। তার তো আরও আগেই এ মেয়েটিকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুক্তচিন্তা ও উদার মনের অধিকারী, প্রগতিশীল কমিউনিস্ট নেতা ফরিদ খানের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল নিতান্ত সহজ। এছাড়া রুশ বাহিনীর সামনে ‘না’ শব্দটি উচ্চারণ করার মতো দুঃসাহস তো কাবুলের সরকার প্রধানেরও নেই। কিন্তু ফরিদ খান খুব ভালো করেই জানেন যে, তার মেয়ে নাহিদকে কোনক্রমেই ক্লাবে নিয়ে নাচানো যাবে না। অতএব, খুবই নরম স্বরে ফরিদ খান বলে চললেনঃ নাহিদ খুব লাজুক মেয়ে। ক্লাবে গিয়ে সে নাচতে রাজী হবে না। রুশ কর্মকর্তা ধমকের সুরে বললেনঃ তুমি না কমিউনিস্ট! ফরিদ খান দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ জি, অবশ্যই আমি কমিউনিস্ট। রুশ কর্মকর্তা

অত্যন্ত রাগতস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেনঃ না, তুমি কমিউনিস্ট হতে পারোনি। কোন কমিউনিস্টই এমন সেকেলে হতে পারে না। কোন কমিউনিস্টের স্ত্রী-কন্যাই বিদ্রোহী মৌলবাদীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না। আমাদের মেয়েরা তো স্বাচ্ছন্দ্যে নেচে-গেয়ে ক্লাবগুলোকে মাতিয়ে রাখে। যদি আসলেই তোমরা দেশের সত্যিকার উন্নতি আর সমৃদ্ধি চাও, তবে পাক্কা কমিউনিস্ট হয়ে যাও। নিজেদের স্ত্রী, কন্যাদের তথাকথিত লজ্জা-শরমের শিকল মুক্ত করে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে দাও। এ ব্যাপারেই তো আমরা এতোদূর থেকে তোমাদের সহায়তায় ছুটে এসেছি।

রুশ কর্মকর্তার এসব কথা শুনে ফরিদ খান খুবই লজ্জিত হলেন। রুশ সেনা অফিসারটি ফরিদ খানকে প্রগতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। নিজেকে পাকা কমিউনিস্ট প্রমাণিত করার আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি রুশ প্রভুদের অসন্তুষ্টির ভয়ও ফরিদ খানের মনে। মেয়েকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি। নাহিদ যদি ক্লাবে গিয়ে রুশ সৈন্যদের সাথে একটু নাচতে সম্মত হয়, তাহলে তার বাবার পদমর্যাদা বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার সম্পর্কের সকল সুফল। এসব শুনে নাহিদ ভেতরে ভেতরে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে। সে অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠোর উচ্চারণে বাবাকে বলে, আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি বলেই একজন খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও আপনার সাথেই আমি এখনো বসবাস করছি। আমি ভাবতেও পারি না যে, কোন জন্মদাতা পিতা এতো আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে। আপনি তো শুধু ইসলামই ত্যাগ করেননি; বরং আমাদের দেশীয় এবং সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলো পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন।

ফরিদ খান তার কিশোরী কন্যাকে স্নেহমাখা গলায় বুঝাতে শুরু করেনঃ "শোন মা নাহিদ, তুমি বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছো। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। ইসলাম একটা মধ্যযুগীয় আদর্শ। অনেক পুরনো কিছু নীতিকথা। একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী সরলমনা জনসাধারণকে শোষণ করার উদ্দেশে এসব বিধি-নিষেধের জাল পেতেছে। দেড় হাজার বছর আগে একসময় ইসলাম হয়তো আধুনিক একটা জীবনাদর্শ হিসেবে সফল হয়েছিলো, কিন্তু তাই বলে বর্তমান উন্নতি ও প্রগতির যুগে সেটিই আঁকড়ে রাখতে হবে কেন? কী করে সম্ভব হাজার বছর আগের একটা আদর্শ এ সময়েও অনুসরণ করে চলা। নাহিদ, তুমি কি কোনদিন চিন্তা করে দেখেছ? লজ্জা-শরম ও শালীনতার দোহাই দিয়ে আফগান নারীসমাজের উপর কী

পরিমাণ নির্যাতন চলছে। এসব মোল্লা-মওলবীরা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, সেই আমেরিকার অবস্থাই চিন্তা কর। ওখানে তো নারীরা স্বাধীন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। কল-কারখানায় পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সভা-সমিতিতে মহিলারা অবাধে যাতায়াত করছে। কিন্তু এসব মওলবীরাই আবার ইসলামের নামে স্বদেশী নারীসমাজকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যদি তুমি নিজকে সময়ের সাথে পরিচালিত না কর, তাহলে অনেক পেছনে পড়ে যাবে। আমি চাই তুমি সামাজিক হও। তুমি যতোটুকু সুন্দরী সে পরিমাণ সামাজিকতা যদি তোমার মাঝে সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু তোমার বাবার মর্যাদাই বাড়বে না, তোমার জীবনেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। মনের মতো সঙ্গী পাবে তুমি। বড় বড় সোভিয়েত কর্মকর্তারাও তোমাকে বিয়ে করার জন্যে ঘুর ঘুর করবে।”

তার বাবা যে এতো বেশি প্রগতিশীল হয়ে গেছে, আত্মমর্যাদাবোধ বা সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই যে তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়টি এতো স্পষ্টভাবে আর কখনো ধরা পড়েনি নাহিদের কাছে। নিজের কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েও নাহিদ খুবই স্বাভাবিক হয়ে বললোঃ “আপনি যে জীবনাদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বলছেন, সে জীবনাদর্শই নারী জাতিকে ঐ মর্যাদা দিয়েছে যা আমেরিকা আর রাশিয়াও দিতে পারেনি। ইসলামে মা, বোন ও কন্যার যে সম্মান রয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শে, ধর্মে বা মতবাদে কি সে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাদের? স্ত্রীকে যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে তার কি কোন তুলনা হয়? আপনার বক্তব্য শুনে তো আপনাকে বাবা বলে ডাকতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনি নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করেছেন। নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা বেচে দিয়েছেন। এখন নিজের কন্যার মান-ইজ্জতও বিকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। আপনি কি চান যে, আপনার কন্যা নাস্তিক কাফেরদের সামনে নৃত্য করুক? তাদের হাতে হাত রেখে মাখামাখি করুক? এসব তো আমি কোন মুসলমানের সামনেও করতে রাজী নই। আপনি এখন আর আমার পিতা হওয়ার যোগ্য নন। আপনি এখন একজন ঈমান বিক্রেতা দেশের স্বাধীনতা ও আপন কন্যা সন্তানের সম্ভ্রমের সওদাগর।”

জওয়াব শুনে ফরিদ খান খুবই চিন্তিত হলো। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে, বললো।

ঃ তোমার ধর্ম তোমাকে কি এ শিক্ষা দিয়েছে যে, নিজের পিতার সাথে এমন বেআদবীসূচক কথাবার্তা বলবে। যে পিতা শুধু তোমার উন্নতি ও সুখের কথাই

ভেবে থাকে।

ঃ হাঁ, আমার ধর্ম আমাকে এ শিক্ষাই দেয় যে, নিজের জন্মদাতা পিতাও যদি ইসলাম-বিদ্বেষী ও খোদাবিমুখ মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তার পিতৃত্বের বন্ধনও ছিন্ন হয়ে পড়ে। নাচতে যাওয়ার জন্যে ফরিদ খান নাহিদকে অনেকভাবেই রাজী করতে চেষ্টা করলো। প্রথম আদর করে, বুঝিয়ে, অবশেষে ধমকের স্বরেও তাকে রাজী করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একমতো জোর করেই একদিন ফরিদ খান নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রুশ সেনা অফিসারদের সাথে রেখে বাইরে চলে যায়।

রুশরা নাহিদকে নাচতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়। নাহিদ কিছুতেই নাচবে না। সে সামরিক ব্যক্তিদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, আমি মুসলমান। আল্লাহ্র রাস্তায় আমার এ নগণ্য প্রাণটা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের সাথে আমি নাচে শরীক হবো না।

জনৈক রুশ সেনা অফিসার বললোঃ ইসলাম তো আফগানিস্তান থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। আর এ ক্লাবের জলসা ঘরে তোমার আল্লাহও আসবেন না। নরম কথায় যদি তুমি রাজী না হও, তবে অন্য রাস্তাও আমাদের জানা আছে।

নাহিদঃ তুমিও হয়তো ভুলে যাচ্ছো যে, আমি এক পাহাড়ী মেয়ে। সব ধরনের নিপীড়ন সওয়ার মতো মনোবল ও ধৈর্য আমার রয়েছে।

অফিসারঃ তোমারও মনে হয় জানা নেই যে, রুশীয়দের হাতে এমন শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে, যা বিশালকায় পর্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম।

নাহিদঃ আমার আল্লাহ তোমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁর এক দুর্বল বাঁদীকে কষ্ট দিতে যদি তোমাদের এতোই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ্, আমাকে একটা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও শক্ত ও কঠোর দেখতে পাবে।

রুশ সেনা অফিসার নিরাশ হয়ে নির্যাতনের পথই বেছে নিলো। নাহিদের গায়ের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে তার শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের স্যাঁকা দিতে লাগলো সৈন্যরা। ছুরির খোঁচায় তাঁর শরীরে নিজের অপবিত্র নাম লিখতে লাগলো সে পাষণ্ড অফিসার। সবকিছু চরম ধৈর্যের সাথে মুখ বুজে সয়ে গেলো নাহিদ। সে এমন এক পর্বত বনে গেলো, যার সাথে টক্কর দিলে যে কেউ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। সারা রাতভর পাশবিক নির্যাতনে শেষ রাতের দিকে নাহিদ শহীদ হয়ে গেলো। কিন্তু রুশ সৈন্যরা তাকে নাচাতে পারেনি। মৃত্যুর সময় নাহিদ শরীরের

সমস্ত শক্তি দিয়ে দুটো শ্লোগান তুলেছিলো। 'আল্লাহু আকবর' ও 'আফগানিস্তান জিন্দাবাদ।' এই ছিল নাহিদের শেষ কথা।

শহীদ হওয়ার পর রুশীয়রা নাহিদের অনাবৃত দেহ একটি মসজিদের চত্বরে ফেলে রাখে। ফজরের সময় আগত মুসল্লীরা লাশটি দেখতে পেলে গোটা এলাকা জুড়ে শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে। পরদিন স্কুলের ছাত্রীরা যখন নাহিদের শাহাদতের সংবাদ পেলো, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নেত্রী, তাদের বান্ধবীর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্যে সেই মসজিদের চত্বরে সমবেত হয়। নাহিদের লাশ ছুঁয়ে তারা জিহাদের শপথ নেয় এবং তার রক্ত দিয়ে মসজিদের প্রাচীরে একজন ছাত্রী লিখে দেয় 'আযাদী।'

এরপর যখন রাবেয়া বলখী স্কুলের ছাত্রীরা নাহিদের লাশ নিয়ে মিছিল করতে থাকে; শুরু হয় গোলাবর্ষণ। একে একে ২৩ জন মুসলিম ছাত্রী শাহাদতবরণ করে। আহত হয় অনেকে। এ ঘটনার পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু আফগান মুসলিম জনসাধারণ তথা আযাদীর সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের হৃদয়ে নাহিদ ও তার বান্ধবীদের স্মৃতি আজো অম্লান হয়ে আছে মসজিদের প্রাচীরে এখনো রয়ে গেছে নাহিদের রক্তে লেখা আযাদীর পয়গাম।

যতোদিন পর্যন্ত আফগান মাটি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন না হয়েছে, নিশ্চিহ্ন না হয়েছে সর্বশেষ গাদ্দার কমিউনিস্টটি–ততোদিন পর্যন্তই নাহিদ ও তার বান্ধবীরা অনুপ্রেরণা হয়ে আছে স্বাধীনতার সৈনিকদের। বিশ্ব জুড়ে ইসলামের কন্যাদের জীবনে নাহিদ একটি চিরভাস্বর মহিমময় আদর্শ হয়ে অনন্তকালব্যাপী পথের দিশা দেবে। স্মৃতিতে জাগরূক হয়ে থাকবে আলোর মশাল হয়ে।

জিহাদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনা

মিসরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম তাঁর "আয়াতুর রাহমান ফী জিহাদিল আফগান" (আফগান জিহাদে আল্লাহর নিদর্শন) নামক বইয়ে লিখেনঃ "আফগান মুজাহিদ ও শহীদানের বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত কারামতসমূহ আমি নিজ কানে শুনে নিজের হাতে লিখেছি। এসমস্ত কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন।" ডঃ আয্যামের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই থেকে নেয়া বেশ কিছু ঘটনা আমি প্রিয় পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। ডঃ আয্যামের মুখেই শুনুন–

আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের রযমা এবং উরগুন সেক্টরের মুজাহিদ কমান্ডার উমর হানীফ ইসলামী বিপ্লবী মোর্চার নেতা মাওলানা নসরুল্লাহ মনসুরের বাড়ীতে বসে আমাকে বলেছেনঃ

এমন কোন শহীদ আমি দেখিনি যার লাশ বিকৃত বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে।

কোন শহীদের লাশকেই কুকুর স্পর্শ করতে দেখিনি। যদিও কুকুরেরা কমিউনিস্টদের মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করে।

যুদ্ধের প্রয়োজনে দুই-তিন বছরের পুরানো বারোটি কবর আমি নিজে খুঁড়েছি, কিন্তু কোন একটি লাশেও পরিবর্তন দেখিনি।

একবছর পরও দেখেছি শহীদের লাশের জখম হতে তাজা রক্ত ঝরছে।

ইমাম সাহেব আমাকে বলেছেনঃ শহীদ আবদুল মজীদ মুহাম্মদের লাশ তিন মাস পরে আমরা দেখতে পাই। লাশ যেমন ছিল তেমনই; আর মিশ্‌কে আম্বরের খোশবু রয়েছে তাতে।

আবদুল মজীদ হাজী আমাকে বলেছেনঃ গ্রামের মসজিদের এক ইমামের লাশ সাত মাস পরে আমরা পাই। মনে হয় যেন তিনি এমাত্র শহীদ হয়েছেন।

জিহাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মদ মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেনঃ শহীদ নেছার আহমদের লাশ সাত মাস মাটির নিচে থেকেও কিছুই হয়নি।

আবদুল জব্বার নিয়াজী আমাকে বলেছেনঃ তিন-চার মাস পর আমি চার জন শহীদের লাশ পেয়েছি। এদের তিন জনের তো চুল-দাড়ি ও নখ পর্যন্ত বেড়েছে। অন্য একজনের চেহারার একাংশে দেখেছি একটা ক্ষত।

আমার ভাই আবদুস সালামের লাশ দু'সপ্তাহ পরে আমরা উঠাই, সে যেমন ছিলো তেমনই আছে।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেনঃ আমাদের সাথী, একজন তালেব এলেম মুজাহিদ, আবদুস সামাদ শহীদ হলে আমি আর মুজাহিদ ফতহুল্লাহ্ অন্ধকারের ভেতর সামাদের লাশ খুঁজতে বের হই। ফতহুল্লাহ্ বলে ওঠেঃ শহীদ খুবই কাছে, আমি একটি পবিত্র খোশবু পেয়েছি। এরপর আমি নিজেও সে সুগন্ধ পেলাম। ঘ্রাণ অনুসরণ করে আমরা যখন শহীদ আবদুস সামাদের কাছে পৌঁছলাম, দেখি তাঁর শরীরের জখমগুলো হতে প্রবাহিত রক্ত অন্ধকারে চকচক করে জ্বলছে। আলো হয়ে জ্বলছে শহীদী লহু।

মুজাহিদের মিনতি

মশহুর মুজাহিদ আরসালান খান রহমানী–যিনি সোভিয়েত সৈন্য শিবিরে 'মানুষ খেকো' হিসেবে পরিচিত–তিনি আমাকে বলেনঃ আমাদের হাতে একটি মাত্র রকেট লাঞ্চার আর একটি ট্যাংকবিধ্বংসী গোলা। অন্যদিকে শত্রুদের রয়েছে দুই শত ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ী। আমরা আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে বললাম, আয় আল্লাহ! একটি মাত্র অস্ত্রই যেন সঠিকভাবে গিয়ে লাগে। মিস্ যেন না হয়। দোআর পর রকেট নিক্ষেপ করা হলে তা শত্রুদের বিস্ফোরক দ্রব্যের ট্রাকে গিয়ে পড়লো–আগুন আর বিস্ফোরণে ধ্বংস হলো পঁচাশিটি ট্যাংক ও গাড়ী। দুশমন পরাজিত হলো। আমরা বিপুল গনীমতের মাল হাত করলাম। রকেট নিক্ষেপকারী যুবক (বাতুর) কে পরে আমি নিজেই দেখেছি।

চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেনঃ শাতুরী নামক স্থানে আমরা পঁচিশ জন মুজাহিদ ছিলাম। দুই হাজার রুশ সৈন্য আমাদের উপর চড়াও হলে চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে। এতে ৭০/৮০ জন কমিউনিস্ট নিহত হয় আর বন্দী হয় ২৬ জন। আমরা বন্দীদের জিজ্ঞেস করলাম যে, কেন তোমরা হেরে গেলে? তারা বললোঃ চারদিক থেকে অসংখ্য কামান ও ভারী অস্ত্রের গোলা আমাদের কাবু করে ফেলে। মাওলানা আরসালান বলেনঃ আমাদের কাছে কামান-মেশিনগান কিছুই ছিল না। দেশী কাটা বন্দুক দিয়ে আমরা পঁচিশ জন একদিক থেকে গুলি ছুঁড়ছিলাম।

তিনি আরও বলেনঃ প্রায় এক শ' বিশটি ট্যাংক ও বিপুলসংখ্যক সাঁজোয়া গাড়ী আমাদের উপর আক্রমণ করে। এদিকে আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে। অস্ত্র শেষ হয়ে আসছে। বন্দিত্বের ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত প্রায়। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে অসহায় অবস্থার কথা বললাম আমরা। একটু পরে চারদিক থেকে শুরু হলো গোলাবৃষ্টি–রকেট আর বুলেটের ছোটাছুটি। কমিউনিস্টরা পরাজিত হলো। চেয়ে দেখি ময়দানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। মাওলানা আরসালানের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ফেরেশতাদের কাজ।

ফেরেশতাদের গায়েবী ঘোড়া

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেনঃ উরগুন-৩২ নামক স্থানে আমরা কমিউনিস্টদের উপর হামলা করলাম। পাঁচশ'কে হত্যা এবং তিরাশি জনকে বন্দী

করা হলো। বন্দীদের উদ্দেশে আমি বললামঃ তোমরা কেন পরাজিত হলে?–আর আমাদের একজন মুজাহিদকে তোমরা শহীদ করেছ মাত্র।

বন্দীরা বললোঃ তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছ। গুলি ছুঁড়লেও ঘোড়ার গায়ে লাগতো না।

আমি বললামঃ এগুলো বদরের ফেরেশতা। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেনঃ "বালা ইন তাছবিরু ওয়া তাত্তাকু.......বি খামছাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুসাওইমীন" (১২৫–আলে ইমরান) এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা কুরতুবী বলেনঃ যে সৈন্যরা ধৈর্য ও সততার সঙ্গে লড়াই করবে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আগমন করবেন এবং সহযোদ্ধা হবেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা (বদরে অবতীর্ণ পাঁচ হাজার) ফেরেশতাকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্যেই মুজাহিদ বানিয়েছেন।

হযরত হাসান বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্তই এ পাঁচ হাজার ফেরেশতা মুসলমানদের জন্যে প্রতিরক্ষাস্বরূপ। (১৯৪-৪)

মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বলেছেনঃ কমিউনিস্ট সৈন্যরা যখনই তাদের ট্যাংক বহর নিয়ে কোন গ্রামে ঢুকতো, তখন ওরা "ইখওয়ান আল-মুসলিমুনের ঘোড়ার আস্তাবল" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। লোকেরা তখন অবাক হতো। কারণ, ঘোড়া তাদের কখনো ছিল না বা এসব গ্রাম্য মুজাহিদ্‌রা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেনি। এসময় তারা বুঝে নিতো যে, কমিউনিস্টরা ফেরেশতাদের কথাই বলছে।

বুলেটের শেষ নেই

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী বলেনঃ মুজাহিদদের আমি কয়েকটি বুলেট দিলাম। যুদ্ধে গিয়ে তারা অসংখ্য বুলেট ছুঁড়লো। শেষে তারা এসব ফিরিয়েও আনলো। বুলেট কমেনি।

ট্যাংকের তলায় অক্ষত মুজাহিদ

আবদুল জব্বার নিয়াজী আমায় বলেছেনঃ আমি দেখলাম, একটি ট্যাংক গোলাম মুহিউদ্দীন নামক মুজাহিদের উপর দিয়ে চলে গেলো; আর সে জীবিত রয়েছে।

লৌগর অঞ্চলের নায়েবে আমীর আরহাজম মুহাম্মদ ইউসুফ আমাকে বলেছেনঃ মুজাহিদ বদর মুহাম্মদ গুলের উপর দিয়ে একটি ট্যাংক চলে গেলে সে মরেওনি বা আহতও হয়নি।

বিচ্ছুও ছাড়েনি ওদের

"আপনার প্রভুর সৈন্য তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।" (আল-কুরআন) আবদুস সামাদ ও মাহবুবুল্লাহ আমাকে বলেছেঃ কন্দুজ শহরের সমতল ভূমিতে কমিউনিস্ট সেনারা ক্যাম্প করলে বিষাক্ত বিচ্ছু এসে তাদের দংশন করে, এতে ছয় জন নিহত হয় এবং বাকীরা পালিয়ে যায়।

আব্বাকে তোরা মেরেছিস-শয়তান

আবদুল মান্নান আমাকে বলেনঃ মুজাহিদ আমীর জান শহীদ হয়েছেন। বহুদিন পর এই গ্রামে কমিউনিস্টদের ট্যাংক বহর এলে তাঁর তিন বছরের শিশু সন্তান ম্যাচের কাঠি হাতে দুশমনের ট্যাংক জ্বালাতে এলো। সোভিয়েত সেনা অফিসার জিজ্ঞেস করলেন যে, সে কি চায়। তখন অন্যরা উত্তর দিলো, ছেলেটি ট্যাংক পোড়াতে ও তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

মুজাহিদদের বিছানায় সুশান্ত সাপ

উমর হানীফ আমায় বলেছেনঃ বহু সাপ মুজাহিদদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে। দীর্ঘ চার বছরের মাঝেও তারা কোন মুজাহিদকে দংশন করেনি। (আফগান পাহাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য বিষধর সাপ থাকে, যেগুলো সোভিয়েত কমিউনিস্ট সৈন্যদের দংশন করলেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করে না, বরং পাহারা দেয়। এভাবেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চলছে সাপ ও কমিউনিস্টদের লড়াই। বিষধর পাহাড়ী সাপগুলো যেন মুজাহিদদের কতই না আত্মীয়, পুরানো বন্ধু।)

ষোড়শীর মেহেদীরাঙ্গা হাত

মুহাম্মদ ইয়াসির আমায় বলেছেনঃ মুজাহিদদেরকে মসজিদের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখলো বিশাল এক ট্যাংক ডিভিশন। অবরোধের তৃতীয় দিবসে একটি ষোড়শী তরুণী বাইরে বেরিয়ে আল্লাহর কাছে মিনতি করলোঃ ইয়া রব, মুজাহিদদের কোন ক্ষতি না করে আমাকে তুমি তাদের বদলে কবুল কর। আমার উপর দিয়ে তাদের বিপদ কাটিয়ে দাও–দুই দিন পর তার বিয়ের কথা ছিল। হাতে তার মেহেদীর রং। বীরাঙ্গনা তরুণীটি শাহাদতবরণ করলো আর বেঁচে গেলেন মুজাহিদরা।

ঘুমন্ত বোমা

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ আমরা ত্রিশ জন মুজাহিদের উপর বোমারু বিমান হামলা চালায়। বোমাগুলো আমাদের চারপাশে পড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে। একটি বোমা একেবারে আমাদের উপরই পড়ে, কিন্তু বিস্ফোরিত হয়নি। প্রায় ৪৫ কেজি ওজনের এ বোমাটি যদি ঘুমিয়ে না থেকে ফেটে পড়তো, তাহলে আমরা ত্রিশ জনই শেষ হয়ে যেতাম।

আমাকে আবদুল মান্নান বলেছেনঃ আমরা তিন হাজার মুজাহিদ আমাদের সেন্টারে ছিলাম। সোভিয়েত বিমান আমাদের উপর তিন শত নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু একটি বোমাও ফাটেনি। পরে আমরা এই তিনশ' বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সেন্টারে নিয়ে আসি।

খোশনসীব শহীদের গর্বিত মা

ভাই মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেনঃ আমাদের এক সাথী শাহাদতবরণ করলো। নাম তার আন্‌জীর গুল। খবর পেয়ে শহীদের মা সুন্দর কাপড়-চোপড় পরে হাসি-খুশী চলাফেরা করতে লাগলেন। আর পাড়ার অন্যান্য লোক তাদের পড়শীর শাহাদতে বন্দুকের ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করলো। পুত্র শহীদ হলে আফগান মায়েরা খুশীই হন। কারণ, এর চেয়ে বড় কোন সম্মান তাঁদের দৃষ্টিতে নেই।

বুলেট প্রুফ শরীর

মাওলানা জালালুদ্দীন আমায় বলেছেনঃ আমার সাথীদের মাঝে অনেক যুদ্ধফেরত মুজাহিদকে দেখেছি, যাদের জামা-কাপড় বুলেটের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু তাদের গায়ে একটি বুলেটও ঢোকেনি।

শায়খ আহমদ শরীফ বলেছেনঃ আমার ছেলে যুদ্ধ হতে ফিরে এলো। তার পোশাক ছেঁড়া, অথচ গায়ে তার কোন আঘাত নেই।

নাসরুল্লাহ মনসুরের সচিব আমাকে বলেছেনঃ আজ ১.৪.৮২ একজন মুজাহিদ এসে পৌঁছেছে যার মাথায় দশটি এবং বাহুদ্বয়ে পনেরটি গুলি লেগেছে, অথচ সে জীবিত রয়েছে।

মওলবী পীর মুহাম্মদ আমাকে বলেছেনঃ আমরা ১০ জন মুজাহিদ পাকতিয়া অঞ্চলে ছিলাম। ১৮০টি বিমানের এক বহর সমতল ভূমিতে আমাদের ঘিরে ফেলে

এবং মুষলধারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। আমরা যখন লড়াই শেষ করলাম তখন আমাদের গায়ের জামা কাপড় তেনা তেনা হয়ে গেছে। আশ্চর্য! আমরা কেউ আহত হইনি। কমিউনিস্ট মেরেছি ১৬০ জন। আর বিমান নামিয়েছি তিনটি। আমাদের দুই জন শাহাদত লাভ করেছেন।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর বুকে যে বুলেটের মালা থাকে, তার নিচে একটা গুলি লেগেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি। এটা আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ আমি একটি বোমার উপর দিয়ে যেতে বোমাটি আমার পায়ের তলায় বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু আমি এতে মোটেও আহত হইনি।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেনঃ দুইবার আমার পায়ে রকেট পতিত হয়, কিন্তু আমি কোন কষ্টই পাইনি।

শহীদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি

পশ্চিম কান্দাহারের হিলমুন্ড এলাকার নেতা মুজাহিদ আবদুল মান্নান আমাকে বলেছেনঃ আমরা ছিলাম ৬০০ মুজাহিদ আর দুশমনরা ছিল ছয় হাজার। এরা সবাই রুশ সেনাবাহিনীর সদস্য, এদের সাথে ছয়শ' ট্যাংক ও পঁয়তাল্লিশটি বিমান। ওরা হামলা করলে দীর্ঘ আঠারো দিন যুদ্ধ চললো। ফলাফলঃ মুজাহিদ ৩৩ জন শহীদ হয়। দুশমনদের ক্ষয়-ক্ষতিঃ সোভিয়েত সৈন্য ৪৫০ জন নিহত। বন্দী ৩৬ জন। ৩০টি ট্যাংক আমরা চুরমার করে দেই এবং বিমান ভূপাতিত করি ২টি। যুদ্ধের আঠারোটা দিন শহীদরা সব এমনিই পড়ে থাকে। মওসুম ছিল গরমের। কিন্তু একটি লাশও পরিবর্তন হয়নি, দুর্গন্ধও না। শহীদানের মধ্যে আবদুল গফুর বিন দীন মুহাম্মদ একজন। প্রতিরাতেই তাঁর দেহ থেকে একটা আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠতো এবং তা বেশ ক'মিনিট ধরেই থাকতো, যা সমস্ত মুজাহিদই দেখেছেন।

উমর হানীফ আমায় বলেছেনঃ ১৯৮২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতি রাতেই আকাশ হতে নূর এসে মুজাহিদদের বাসস্থানের সামনে বহুক্ষণ ধরে দাপাদাপি করতো। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে যেতো।

আগুন সেখানে অচল

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ চার বছর ধরে (এখন দশ বছর) আমাদের উপর বিমান হামলা চলছে। এতে ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়, জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায় সকল তাঁবু কিন্তু রসদ ও অস্ত্রাগার কোনদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

আল্লাহ্‌র নির্দেশে

শত-সহস্র ঘটনার মাঝে মাত্র দুটো যুদ্ধের ঘটনা শায়খ জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে শুনিয়েছেনঃ

একঃ তারাকী আমলে। দুইঃ ১৯৮২ সালে।

ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র

প্রথমঃ মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেনঃ তারাকী আমলে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ট্যাংক বহর। আমাদের হাতে কোন P2P7 ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। তখন কিছু টাকা জমা করে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম একটা এন্টি-ট্যাংক হাতিয়ারের জন্যে। কোন লাভ হলো না, বেহুদাই ঘোরা হলো। আমরা ছিলাম ৩০ জন। একদিন তারাকীর বাহিনী আমাদের আক্রমণ করে বসলো। তাদের সাথে হাজার হাজার ট্যাংক, কামান, ভারী মেশিনগান। আড়াই দিন যুদ্ধ চললো। কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী হারলো। আমরা গনীমতের মাল লাভ করলাম P2P7 ২৫টি ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র। আটটি ট্যাংক এবং একহাজার যুদ্ধবন্দী। এদের প্রত্যেকের সাথে একেকটা ক্লাসনিকোভ।

বিরাশির লড়াই

দ্বিতীয়ঃ মাওলানা হাক্কানী বলেনঃ আমরা ছিলাম ৫৯ জন মুজাহিদ। শত্রুরা আমাদের উপর চড়াও হলো। তাদের সাথে ২২০টি ট্যাংক–সামরিক ট্রাক। উপরে তো বোমারু বিমান বোমাবর্ষণে লেগেই আছে। মানুষও তারা পনেরশ'। ওদের সংখ্যা আমরা ওদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম।

ফলাফলঃ ৪৫টি ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ী বিধ্বস্ত। আহত-নিহত কমিউনিস্ট ২৫০ জন। বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ১০০। ক্রেনকভ ক্ষেপণাস্ত্র ৩, ক্লাসনিকোভ ৭, সিক্সটি সিক্স মি মি কামান ও কামানের গোলা ২৮০, বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ ৩৬ হাজার।

সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উত্তর কাবুলের লড়াই

আলহাজ মুহাম্মদ গুল আমাকে বলেছেনঃ সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উত্তর কাবুলের লড়াইয়ে মুজাহিদ ছিলেন ১২০জন। দুশমনদের সংখ্যা ১০০০০ রুশীয় সৈন্য। তাদের ট্যাংক আট শত, বিমান পঁচিশটি।

ফলাফলঃ ৪৫০ জন রুশ নিহত এবং ১৩০ জন মিলিশিয়া নিহত, ১৫০টি ট্যাংক বিধ্বস্ত। ডিনামাইট ও রসদ বোঝাই এগারোটি গাড়ী দখল।

এর একমাস পর

মুহাম্মদ গুল বলেনঃ মুজাহিদ ৫০০, রুশ সৈন্য ট্যাংক ডিভিশনসহ দশ হাজারের উপর।

ফলাফলঃ আমরা ১২০০ দুশমন শেষ করেছি। দীর্ঘ একমাস এলাকাটি ছিল পূতিগন্ধময়।

ফুলের তোড়া ও মিয়া গুল

অধ্যাপক মাওলানা সাইয়াফের এক সহকারী মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বলেনঃ আদীল মিয়া গুল ছিলেন বাগলান এলাকার চীফ কমান্ডার। তিনি রবিউল আওয়াল ১৪০৩ হিজরীতে শহীদ হন। মিয়া গুল ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কৃতী সন্তান ও প্রখ্যাত নেতা। তাঁর শাহাদাতে তাঁর বংশের লোকজন সাংঘাতিক রকম আঘাত পেলো। তাঁর নিজ বংশ 'আহমদ জাঈ' গোত্রের লোকসংখ্যা একলক্ষ বলে শোনা যায়।

মিয়া গুল ছিলেন তাঁদের ভাইদের মধ্যে চতুর্থ শহীদ। মিয়া গুলের শাহাদাতে তাঁর পরিবারবর্গ খুবই চিন্তিত ও শোকাহত হয়ে পড়ে এবং তাঁর জন্যে কান্নাকাটি চলতেই থাকে। তাঁর ভাই রাতের বেলা ওযু করে আল্লাহর কাছে দোআ-কান্নাকাটি করে বললেনঃ আয় আল্লাহ্! আমার ভাই যদি শহীদী মওত পেয়ে থাকে তাহলে এর একটা চিহ্ন আমাদের দেখাও। দোআর পর তিনি শেষ রাতে নামাযের জন্যে ওঠার নিয়তে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ যেন কি একটা পতনের শব্দ হলো–তারা লাইট জ্বেলে দেখলেন, একটা পুষ্পস্তবক। অতুলনীয় এ তোড়াটির গা শিশিরসিক্ত। অজ্ঞাতপূর্ব এক জান্নাতী খোশবু বের হচ্ছে তা থেকে। সারাটা ঘর সুরভিতে 'ম' 'ম' করছে। পরিবারের সবাই জমা হলো এবং এই কারামতটি প্রত্যক্ষ করলো। সকালে মুহাম্মদ ইয়াসিরকে দেখাবে বলে কুরআন শরীফের কাছে তোড়াটিকে তারা রেখে দিলো, কিন্তু সকাল বেলা আর এটা পাওয়া গেলো না।

রণাঙ্গনে প্রশান্তিময় তন্দ্রা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ "যখন আল্লাহর তরফ হতে তন্দ্রা এসে তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেললো।"–(আনফাল-১১)

মুখতাসার ইবনে কাসীর সাবুনীতে বর্ণিত হয়েছে (২-৯০), হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, ওহুদের দিনে তন্দ্রাচ্ছন্নদের মধ্যে আমিও ছিলাম। বারবার আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেছে। পড়ে আর তুলি। পড়ে যায় আর উঠাই। সবাইকে দেখলাম, তারা ঢালের নিচে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আরামরত। হাফেয আবু ইয়ালা হযরত আলী (কাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ বদরের দিন 'মিকদাদ' ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন ঘোড়সওয়ার ছিল না। আমাদের মাঝে কেউ জেগে নেই। শুধু হুযুর আকরাম (সাঃ) গাছের তলায় নামায পড়ছেন আর কাঁদছে–সকাল হওয়া পর্যন্তই এমনটি চলছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, লড়াইয়ের সময় প্রশান্তিময় তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ হতে থাকে আর সালাতের ভেতর শয়তানের পক্ষ হতে।

আরসালানের সুখনিদ্রা

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেছেন, তিনি শাহীকো যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব ধরনের বোমা ও রকেট বৃষ্টির ভেতর দশ মিনিট সময় নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন।

দরবকী রণাঙ্গনের কথা আমাকে বলেছেন আবদুর রহমান। তিনি বলেনঃ

দেড়শ' থেকে দুইশ' ট্যাংক আমাদের উপর হামলা করে। অত্যধিক গোলা ও শেল বর্ষণে মুজাহিদরা ২/৩ দিন কিছুই শুনতে পায়নি। অতঃপর যুদ্ধ চলাকালীনই আমাদের উপর ঘুম নেমে এলো। যখন উঠলাম তখন সবাই নিশ্চিন্ত। একজন মুজাহিদ ট্যাংকের উপর হামলা করলে সেটা জ্বলে গেল। জ্বলন্ত ট্যাংকের ভগ্নাবশেষ ছিটকে গিয়ে পড়লো অস্ত্র বোঝাই ট্রাকের উপর। গোলাবারুদের বিস্ফোরণে ৭টি গাড়ী শেষ। আমরা ৫টি গাড়ী গনীমতের মাল হিসেবে পাই।

ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ারের দেহরক্ষী আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ যুদ্ধের মাঠে কয়েকবারই আমার উপর নিন্দ্রা নেমে আসে। আমি এটাকে আল্লাহর নেয়ামত এবং তাঁর তরফ হতে দেয়া প্রশান্তি বলে মনে করি।

পাঘমানের আবদুর রশীদ আবদুল কাদির আমায় বলেছেনঃ সোভিয়েত

সৈন্যদের আক্রমণের সময় মুজাহিদদের উপর ঘুম নেমে আসতে আমি তিন তিনবার দেখেছি। এসময় মুজাহিদরা ২/৩ মিনিট ঘুমে অচেতন থাকার পর নব-উদ্দীপনা নিয়ে দাঁড়ান এবং রুশ সৈন্যদের উপর বিজয়ী হন।

মৃত্যুহীন প্রাণ

"নির্দিষ্ট সময়ের আগে এবং আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন প্রাণীই মৃত্যুবরণ করতে পারে না।" (আলে-ইমরান)

"আল্লাহই উত্তম রক্ষক আর তিনি সেরা দয়াময়।"-(ইউসুফ-৬৪) গজনী শালগড়ের মুহাম্মদ মঙ্গল আমাকে বলেছেনঃ আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আখতার মুহাম্মদের উপর দিয়ে ট্যাংক চলে গেলো অথচ সে মরলো না। যখন রুশরা দেখতে পেলো যে, সে মরেনি, তখন আবার তার উপর দিয়ে ট্যাংক চালালো, তবু সে মরলো না। এরপর তারা অন্য দুই জন মুজাহিদসহ আখতারকে ধরে নিয়ে সাব-মেশিনগান দিয়ে গুলি করলো, এতে দু'জন শহীদ হলো এবং তিন জনই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ওরা এসে এদেরকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো। এরপর রুশ কমিউনিস্টরা চলে যাওয়ার পর আখতার মুহাম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের কাছে ফিরে এলো। এখনো সে জীবিত এবং জিহাদরত।

গজনীর মুজাহিদ নসরুল্লাহ হতে বর্ণনা করে মুহাম্মদ মঙ্গল আমাকে শুনিয়েছেন যে, নসরুল্লাহর গায়ে দুটো বুলেট লেগে তাকে আহত না করে তার পকেটে ঢুকে পড়ে। তখন তিনি বুলেট দুটি মুজাহিদদের দেখালেন। মঙ্গলের এ বর্ণনার আরও বহু সাক্ষী রয়েছে।

মাওলানা আরসালান বলেছেনঃ হযরত শাহ তার চোখে দোশকার গুলি খেলেন, তার কিছুই হলো না। একটু যা চোখটা লাল হয়েছে। পাঘমানের কমান্ডার মুহাম্মদ নাঈম আমাকে বলেছেন, একটি বিমান তাদের উপর ১৪টি গোলাবর্ষণ করে। এর মধ্যে ১৩টি গোলা পার্শ্ববর্তী একটি কবরের উপর বিস্ফোরিত হয়। মুজাহিদরা কেউ আহত হয়নি।

তাঁবু পুড়ে ছাই, ভেতরে অক্ষত তিন মুজাহিদ

জালালুদ্দীনের ভাই ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ ১৯৮৩ সনের ৮ই মার্চ আমাদের উপর কামানের দুটি গোলাবর্ষণ করা হয়। আমাদের তাঁবুর নয়টি জায়গা পুড়ে গেলেও ভেতরে অবস্থানরত তিন জনের কারোই কোন ক্ষতি হয়নি। আমার

পোশাক ও আমার বিশ জন সাথীর মধ্যে অধিকাংশের জামা-কাপড় জ্বলে গেলো, কিন্তু একজনও আহত হলো না।

ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ ১৪০২ হিজরীর ২০শে শাবান খোস্ত পাকতিয়া প্রদেশের বিজ্জীর লড়াইয়ে আমাদের উপর গোলা নিক্ষেপ করা হলে আমার টেলিস্কোপ ভেঙ্গে গেলো, জ্বলে গেল আমার পায়জামা। আমি (আবদুল্লাহ আয্যাম) ইব্রাহীমের পায়জামাটি স্বচক্ষে দেখেছি আর শেলোয়ারটি এখনো আমার সংগ্রহে রয়েছে। কেউ আহত হয়নি। উপস্থিত মুজাহিদদের অনেকের গায়েই গোলা পতিত হয়েছে। এতে অনেকের বুকে বাঁধা বুলেটের বেল্ট ছিঁড়ে গেছে, কাপড় পুড়েছে, কিন্তু একজনও তারা আহত হয়নি।

ইব্রাহীমের গাড়ী একটি ডিনামাইটের উপর দিয়ে চলে গেলেও সেটি বিস্ফোরিত হয়নি; অথচ অন্য একটি ট্যাংক যাওয়ার সময় ডিনামাইটটি গর্জে ওঠে।

ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ তারা ৩০ জন মুজাহিদ রযমা নামক স্থানে ছিলেন। শত্রুরা ছিল তিন শত। সঙ্গে আছে ট্যাংক বুলডোজার-ট্রাক ইত্যাদির বিরাট এক বহর। দুশমন পরাজিত হলো। আমরা গনীমত লাভ করলাম দুটি কামান, একটি গাড়ী, তিনশ' গোলা ও মাইন, বুলেট ত্রিশ হাজার, ছয়টি ক্লাসনিকোভ গান। যুদ্ধলব্ধ মাল ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার বোঝাই করলাম গাড়ীতে। মুহাম্মদ রাসূল গাড়ীটি ড্রাইভ করছিল আর আমি তার পাশের সীটে। গাড়ী একটি ডিনামাইটের উপর দিয়ে চলে গেলো সেটা বিস্ফোরিত হলো না। অথচ এ ডিনামাইটটির উপর দিয়েই একটা রুশ ট্যাংক যাওয়ার সময় সেটি গর্জে ওঠলো।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, কামানের ভেতর R. P. J গোলা বুলেটের আঘাতে ছিদ্র হয়ে গেছে, কিন্তু কামান বহনকারী মুজাহিদটির কিছুই হয়নি।

জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের ভাই খলীলের টেলিস্কোপের কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, কিন্তু খলীল অক্ষত-নিরাপদ। ভাঙ্গা টেলিস্কোপটি আমিও দেখেছি।

ফত্হুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ যরগন শাহ্ মুজাহিদের পকেটে গুলি লেগে কাপড় ও ডাইরী জ্বলে গেছে, ভেঙ্গে গেছে পকেটে রাখা আয়না, কিন্তু যরগন শাহ্ কোন আঘাত পায়নি।

তিনি আরও বলেছেনঃ বিমানের গোলাবর্ষণে তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু ভেতরের মুজাহিদদের কারোই কিছু হয়নি।

আকলুদ্দীনের দুই পায়ের মাঝে গোলা বিস্ফোরিত হয়, তার সাথে ছিল আবদুর রহমান। তারা একজনও আহত হয়নি।

কমান্ডার আবদুর রহমান আমাকে এ কাহিনীটি শুনিয়েছেনঃ মুজাহিদদের ট্যাংকের নিচে পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হলে তাদের মাথার পাগড়ী উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

'বারী' কিল্লা জয় করার উদ্দেশে ফত্হুল্লাহ ও ইব্রাহীম ট্যাংক নিয়ে এগিয়ে চললেন। নিচে মাইন বিস্ফোরিত হলে তাঁদের মাথার পাগড়ী উড়ে গেলো। অথচ তাঁরা কেউ আহত হলেন না।

আবদুল করীম আমায় বলেছেনঃ মুজাহিদ কমান্ডার আবদুল আলীকে দেখলাম, বুলেটের বৃষ্টিতে তার জামা-কাপড় জ্বলে গেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি।

মওলবী ইয়োরদোল আমাকে বলেছেনঃ আমি দশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রামে যাচ্ছি। আটটি বিমান আমার উপর হামলা চালিয়ে যেতে লাগলো। বিমানের পাইলট ও অন্যদের আমি দেখতে পাচ্ছিলাম; আর আমার হাতে ছিল আমার হাতিয়ার।

শহীদী শোণিতের সুরভি

মুজাহিদদের কাছে শহীদের রক্তের খোশবু বড়ই পরিচিত। বহুদূর হতেই তারা এর সুঘ্রাণ পেয়ে থাকেন।

মাওলানা আরসালান খান আমাকে বলেছেনঃ শহীদ আবদুল বছীরের শাহাদাতের স্থানটি আমি অন্ধকার রাতে রক্তের সুগন্ধিতেই চিনেছিলাম।

২.৫ কিলোমিটার দূর হতে শহীদ ওয়ালী জানের সুরভি। আমাকে ইব্রাহীম জালালুদ্দীন বলেছেনঃ তখন গাড়ীতে চলছিলাম। আমি একটা সুবাস পেলাম। তখন আমার সঙ্গীকে বললামঃ এটা শহীদের খোশবু। কারণ, শহীদের রক্তে একটা বিশেষ পবিত্র সুরভি রয়েছে, যা আমাদের অতি চেনা। আর নয়তো, কোন অঞ্চলে শহীদ থাকলেও আমাদের জানার উপায় ছিল না যে, এখানে ঘুমিয়ে আছে কোন শহীদ।

খেয়াল মুহাম্মদ গন্ধ শুঁকে বলতে পারেন কোন্টা শাহাদাতের জায়গা।

আমি একটা সুগন্ধ শুঁক্লাম। সঙ্গীকে বললাম, আকলুদ্দীন মনে হয় এখানেই শহীদ হয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, এখানেই তাঁর শাহাদাত নসীব হয়।

মায়ের স্বপন

■ এক শহীদের মায়ের আঙ্গুলে সুবাস ছির তিন মাসেরও বেশি। নাসরুল্লাহ মনসুর আমাকে বলেছেন যে, হাবীবুল্লাহ ওরফে ইয়াকুত আমায় বলেছেনঃ আমার ভাই শহীদ হওয়ার তিন মাস পর আমার মা তাকে স্বপ্নে দেখলেন। আমার ভাই মাকে বললোঃ আম্মা, আমার সব জখম শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মাথার জখমটা ভালো হয়নি। স্বপ্ন দেখে মা খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কবর খুলে দেখবেন তিনি। ভাইয়ের কবর খুঁড়তে গিয়ে তাঁর কাছে অন্য আরেকটি কবর উদোম হয়ে গেলে আমরা দেখতে পেলাম কবরটির ভেতরে মৃতের উপর একটি অজগর। দেখে মা বললেনঃ নিঃসন্দেহে আমার ভাই শহীদ। তাঁর কবরে সাপ থাকতেই পারে না। অতঃপর আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুললাম, তখন ভুর ভুর করে সুগন্ধের বন্যা এলো। নাকে গিয়ে ঢুকতেই যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম। ভাইয়ের মাথায় আমরা একটি তাজা জখম দেখতে পেলাম। আমার মা আঙ্গুল দিয়ে সেটি ছুঁয়ে দেখলেন, তাঁর আঙ্গুলটি সুবাসিত হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন মাস পর এখনো সে খোশবু রয়ে গেছে। আঙ্গুলটি এখনো সুরভি ছড়াচ্ছে শহীদী লহুর।

■ মুহাম্মদ শিরীন আমাকে বলেনঃ আমাদের সঙ্গী চার জন মুজাহিদ শহীদ হয়। তাঁদের শরীর হতে ছড়ানো মিশ্‌কের মতো সুবাস আমরা চার মাস পরও পেয়েছি।

মরেও তারা অস্ত্র ছাড়েনি

■ লৌগরের শহীদ মীর আগা রিভলবার ছাড়তে চায়নি। যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের এক সঙ্গী মীর আগা শাহাদাতবরণ করে। তার হাতে ছিল একটি রিভলবার। যখন মুজাহিদরা বিভলবারটি নিজেদের সংগ্রহে নিতে চাইলেন, তখন মীর আগা সেটি ছাড়েনি। পরে আমরা তার বাড়ীতে গিয়ে খবর দিলাম। তার পিতা (কাজী মীর সুলতান) এসে বললেনঃ বাবা, এ রিভলবার তো তোমার নয়, এটি মুজাহিদীনের–তৎক্ষণাৎ সে রিভলবারটি রেখে দিলো।

■ লৌগরের শহীদ সুলতান মুহাম্মদ ক্লাসনিকোভ গান দিতে চায়নি। যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের সাথী সুলতান মুহাম্মদ ১৯৮৩ সালের মার্চে শহীদ হয়। শাহাদাতের পর সে তার ক্লাসনিকোভটি কোলে চেপে রাখে। রুশ সৈন্যরা এসে অস্ত্রটি হাত করার জন্যে চেষ্টা করলো, কিন্তু শহীদ দুশমনদের হাতে সেটি দিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত লাল সেনারা তার হাত কেটে ক্লাসনিকোভটা নিয়ে গেলো।

■ মুহাম্মদ শিরীন আমাকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইসমাঈল এবং গোলাম হযরত শাহাদাতের পরও অস্ত্র দিতে রাজী হয়নি।

শহীদানের মুখে হাসি

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেছেন যে, বিমানের গোলার আঘাতে শহীদ হলো নেক্‌কার তালেবে এল্‌ম আবদুল জলীল। আসরের সময় জানাযার পর তাকে তার বাড়ীতে পাঠানো হলে মুজাহিদরা সকাল পর্যন্ত তার লাশের সাথে ছিলেন। আবদুল জলীল চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে হাসছিলো। এমন অবস্থা দেখে মুজাহিদরা আরসালানের কাছে এসে বললেনঃ আবদুল জলীল মারা যায়নি। আরসালান বললেনঃ অবশ্যই সে শহীদ হয়ে গেছে। মুজাহিদরা বললেনঃ তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাকে দাফন করা জায়েয হবে না। প্রয়োজনে পুনরায় তার জানাযা পড়তে হবে। আরসালান বললেনঃ সে গতকালই শহীদ হয়েছে। আর এটা তার কারামত।

হামীদুল্লাহ হাসছিলো

■ পাঘমানের জেনারেল কমান্ডার উমর আমাকে বলেছেনঃ আমাদের সহযোদ্ধা হামীদুল্লাহ শহীদ হলে তাকে দাফন করার সময় দেখি সে হাসছে। মনে মনে ভাবলাম যে, আমি ভুল করছি না তো। লাশ বাইরে রেখে চোখ কচলে নিয়ে ভালোমতো লক্ষ্য করলাম। নাহ্! সে হাসছেই।

■ মাওলানা হাক্কানী বাহিনীর বড় নেতা ফত্‌হুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ দাফনের চার দিন পর শহীদ ছোহবত খানকে আমি দেখলাম সে হাসছে। অতঃপর আমরা তার কবর খুঁড়লাম। খায়রুল্লাহ বলেনঃ আমি লক্ষ্য করলাম, শহীদ আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো।

হামীদুল্লাহ হাসছিলো

■ মৌলবী আবদুল করীম আমাকে বলেছেনঃ প্রায় বারোশ' শহীদ আমি দেখেছি। এদের একজনের লাশেও কোন পরিবর্তন হয়নি বা কারো লাশকেই কুকুরেরা স্পর্শ করেনি। যদিও আফগানিস্তানের পাহাড়ী কুত্তাগুলি কমিউনিস্টদের লাশ খায়।

■ ফতহুল্লাহ্ বলেছেনঃ হাকীম খান নামক আমার নেতৃত্বাধীন একজন মুজাহিদ আমাকে বললোঃ তমীজ খান নামের একজন মুজাহিদকে আমরা সাত

মাস পর কবর থেকে উঠালাম। লাশে কোনরূপ পরিবর্তন নেই; আর প্রবহমান রক্ত সুবাস ছড়াচ্ছে।

■ জাদরান পাক্‌তিয়ার জালালুদ্দীন আমাকে বলেছেনঃ কোন শহীদকেই আমি কুকুরে খেতে দেখিনি। গোলাপ নামের এক শহীদকে আমি দেখেছি। পঁচিশ দিন তার লাশ ময়দানে পড়ে ছিল। আশেপাশে বহু কমিউনিস্টের মরা লাশ কুকুরে খেলেও তারা শহীদের লাশে মুখ লাগায়নি।

শহীদ মায়ের বুকে দুধের মেয়ে

ইয়েরদিল ও তার সহকারী মুহাম্মদ করীম আমাকে বলেছেনঃ মঙ্গল নামক ব্যক্তির স্ত্রী ও শিশু কন্যা শহীদ হলে লোকজন এসে দুধের বাচ্চাটিকে মায়ের বুক থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো (শহীদ মা ও শহীদ শিশু কন্যা একই সাথে গলাগলি জড়ানো এবং মেয়েটির মুখে এখনো দুধের বোঁটা।) হানাফী মাযহাবে প্রয়োজন ছাড়া একই কবরে দু'জনকে দাফন করা নিষেধ। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উলামারা ফতওয়া দিলেন, মা-মেয়েকে একই কবরে শোয়ানোর জন্যে।

আল্লাহর সাহায্য ও মুজাহিদদের ফরিয়াদ

■ অস্ত্র ও রসদ শেষ–আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়–ইয়োরদিল আমাকে বলেছেনঃ চগতু ও ওরদক অঞ্চলে সাত দিন ধরে কমিউনিস্টদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চললো। সাত দিনের মাথায় আমাদের অস্ত্রপাতি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলে ঐ রাতেই তিন দিক থেকে দুশমনদের উপর শুরু হলো গোলাবৃষ্টি। আমরা জানি না কোত্থেকে আসছে এসব। কাফেররা তো অবাক। কারণ, এমন জাতের বুলেট-গোলা-মর্টার-রকেট ও অন্যান্য অস্ত্র তারা এর আগে কোনদিন দেখেনি। সুতরাং বত্রিশ জন অফিসারসহ মোট পাঁচশ' কমিউনিস্ট মরলো। বাকীরা প্রাণ নিয়ে পালালো। যে কয়জন মুসলমানকে বন্দী করে তারা নিয়ে গেলো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এসব মডেলের অস্ত্র তোমরা কোত্থেকে সংগ্রহ কর? আমরা (রাশানরা) কোনদিন এসব অস্ত্র দেখিনি।

পাথর ফেটে পানি

সাঈদুর রহমান (পাঘমান) আমায় বলেছেনঃ ওয়াইগিল পাহাড়ে আমাদের খুব পিপাসা হলো। পিপাসা আমাদের কাতর করে ফেললো। পথ চলা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। পাহাড়ী রাখালদের কাছে পানির কথা বললে তারা বললোঃ এ পাহাড়ে

পানি নেই। আমরা ঠায় বসে পড়লাম। হাত তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম। কাছেই তখন একটি পাথর ফেটে পানি বইতে লাগলে আমরা সেদিন পঁয়তাল্লিশ জন মুজাহিদ প্রাণভরে পানি খেয়েছিলাম।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের জামাতা খেয়াল মুহাম্মদ আমায় বলেছেনঃ আমরা ছিলাম ষাট জন। চল্লিশ জন এক জায়গায় আর বিশ জন অন্যখানে। দুশমনরা ছিলো তেরশ'। সঙ্গে তাদের আশিটি ট্যাংক-বুলডোজার-সাঁজোয়া গাড়ীসহ সামরিক কনভয়। আমি (খেয়াল মুহাম্মদ) উঠে দাঁড়িয়ে দো'আ করলাম আর পড়লাম, "ওয়ামা রামাইতা ইয্ রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা।" এরপর এক মুঠ কংকর নিয়ে ছুটে আসা ট্যাংক বহরের দিকে ছুঁড়ে মারলাম। সময়টা ছিল যোহরের পর। প্রচণ্ড গরমে দাঁড়িয়ে এই তদবীরটা করতে যেয়ে আমি কেঁদে ফেললাম। প্রথম ট্যাংকটা যখন আমাদের অবস্থানের কাছাকাছি একটা ব্রীজে উঠছিলো, তখন মুজাহিদদের মেশিনগানগুলো গর্জে উঠলে ট্যাংকটা নিচে গড়িয়ে পড়লো। দ্বিতীয় ট্যাংকের দিকে ছোট্ট একটি বোমা নিক্ষেপ করলো আরেকজন মুজাহিদ। বোমাটি ফাটতেই কাফেররা মনে করলো যে, রাস্তায় মাইন পাতা রয়েছে, সেটাই বিস্ফোরিত হয়েছে। এই কথা ভেবে যেইনা তারা ট্যাংক সাইডে নিয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার নরম পাড়ে ট্যাংকটি গেড়ে বসলো। পাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় নিরুপায় কাফের-কমিউনিস্টরা অস্ত্র জমা দিয়ে একে একে আত্মসমর্পণ করলো।

সেদিন আমরা যা পেয়েছিলামঃ

১. দোশকা।

২. হাউন কামান।

৩. মধ্যম হাউন ১৯টি।

৪. RPJ ১২টি।

৫. ক্লাসনিকোভ (২৬০০) ছাব্বিশ শ'।

৬. ৮২ মি. মি. কামান ৭টি।

৭. দোশকার বুলেট ২৬,০০০টি।

৮. সাঁজোয়া গাড়ী ও অন্যান্য যান ২৫টি।

বিপুল সংখ্যক হাতিয়ার ও যানবাহন আমরা আগেই ধ্বংস করে দেই।

■ বাতুর যুদ্ধের কমান্ডার আবদুর রহমান আমাকে বলেছেনঃ ৮০০ হতে ১২০০ জনের একটি কোম্পানী। সঙ্গে তাদের ৫৮টি ট্যাংক ও গাড়ী। আমরা ৩০ জন মুজাহিদ, ৩ দিন লড়াই চললো। তৃতীয় দিন আমাদের কাছে ব্রেনগানের ৫টি মাত্র গুলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যোহরের নামাযের সময় আমরা পরস্পরে বলাবলি করলাম যে, দুশমনকে রোখার মতো শক্তি আর আমাদের নেই। নামাযের পর হাত তুলে দোআ করলাম। দোআর পর উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ফায়ার করলাম গাড়ী লক্ষ্য করে। আগুন ধরে গেলো গাড়ীগুলোতে। শত্রুরা গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে নেমে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

যুদ্ধলব্ধ গনিমতঃ

১. অক্ষত ট্যাংক ৫টি।

২. বড় আকারের কামান।

৩. অক্ষত গাড়ী ৩০টি।

৪. ১৬টি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপণযোগ্য রকেট (৯ কি. মি.)।

৫. বিপুলসংখ্যক ক্লাসনিকোভ।

আরও কারামত

■ প্রস্তরময় শুকনো যমীন হতে পানি প্রবাহ–পাকিস্তানের এক পাহাড়ী অঞ্চলে কিছুসংখ্যক আফগান বসবাস করতে থাকলে শুকনো স্থানটিতে পানিপ্রবাহ শুরু হলো এবং কিছুদিনের মধ্যে প্রস্তরময় জায়গাটি হয়ে উঠলো শ্যামল-সজীব। সুজলা-সুফলা মাটি দেখে পাকিস্তানীদের মনে লোভ হলো। তারা আফগানীদের বের করে দেয়ার পরই আবার যেই-সেই। সুফলা সবুজ এলাকা আবার প্রাণ-রসহীন, ধূসর হয়ে গেলো।

মেঘমালার ছায়া

মাওলানা হাক্কানী বলেনঃ তারাকী আমলে আমরা পাহাড়ে রান্নাবান্না করতে আগুন জ্বালাতে পারতাম না। যেখানে আমাদের ঘাঁটি ছিল, এর আশেপাশে বহু গুপ্তচর থাকতো। সরকারী টিকটিকির ভয়ে আমরা চিন্তিত। আল্লাহপাক মেঘের ছাদ বানিয়ে দিলেন আমাদের মাথার উপর। মেঘমালার ছায়ায় আর ধোঁয়ার চিহ্নও দেখতে পেতো না কমিউনিস্টদের গোয়েন্দারা।

খোদায়ী রাডার

একথা সর্বজনবিদিত ও সুপ্রমাণিত যে, মুজাহিদদের উপর বিমান হামলার আগে পাখির ঝাঁক চলে আসে। মুজাহিদরা পাকি দেখেই বুঝেন যে, রুশ বিমান আসছে। বিমান যখন বোমাবর্ষণ করতে থাকে, তখন বিমানের নিচে ডানা মেলে দিয়ে বোমা প্রতিহত করে পাখির দল। জঙ্গী বিমানের চেয়ে দ্রুত এদের গতি। (জঙ্গী বিমানের গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্বিগুণ তিন গুণও হয়ে থাকে।)

মুজাহিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, পাখিরা সাথে থাকলে বিমান হামলার ক্ষয়ক্ষতি কম হয়; আর কখনো মোটেও হয় না।

পাখির ঝাঁক যারা দেখেছেন তাদের কয়েকজন–মুহাম্মদ করীমঃ আমি তাদের বিশবারের চেয়ে বেশি দেখেছি। মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীঃ বহুবার আমি পাখিদের দেখেছি। মাওলানা আরসালান খান রহমানীঃ অসংখ্যবার আমি এদের প্রত্যক্ষ করেছি।

যারা সবচেয়ে বেশি স্থানে পাখির ঝাঁক দেখতে পেয়েছেনঃ মুহাম্মদ শিরীন, মওলবী আবদুল হামীদ, এলেম গুল, ফজল মুহাম্মদ, জান মুহাম্মা, খিয়ার মুহাম্মদ, উজীর বাদশা, সৈয়দ আহমদ শাহ, আলী ও জান।

পূর্বোক্ত কারামত ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ যুদ্ধের প্রাথমিক দিক দিয়ে সংঘটিত বিপুলসংখ্যক ঘটনাবলীর একাংশ। যা একজন মিসরীয় বুদ্ধিজীবী, লেখক ডঃ আবদুল্লাহ আয্‌যাম নিজে আফগান জিহাদের কতিপয় মুজাহিদের কাছে শুনেছেন এবং প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী বা ঘটনার নায়কের মুখে শুনে তাঁর বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু সুদীর্ঘ প্রায় দশ বছরের এ মহান জিহাদে আল্লাহর সৈনিকরা যেসব খোদায়ী সাহায্য ও আসমানী বিজয়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছেন তার হাজার ভাগও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। লক্ষ লক্ষ শহীদান ও গাজীদের ঘটনা কি বইপত্রে লিখে রাখা সম্ভব? তবে আফগানিস্তানের খুনরাঙ্গা মাটির প্রতিটি ইঙ্গিতে দেখা গেছে আল্লাহর নুসরত। যা সারা বিশ্ব-বিবেককে নাড়া দিয়েছে। কলজে কাঁপিয়ে দিয়েছে সকল তাগুতী শক্তির। রুশ-মার্কিন আগ্রাসী পরাশক্তিদ্বয়ের পিলে চমকে দিয়েছে। যাতে হৃৎকম্প শুরু হয়েছে ইহুদী-ইসরাঈল ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের।

অপরদিকে এসব জিন্দা কারামত সমস্ত মুসলিম উম্মাহর প্রাণে জাগিয়েছে নতুন চেতনার অগ্নিমশাল–আশার সহস্র প্রদীপ। ইসলামী দুনিয়া জুড়ে জন্ম

দিয়েছে জিহাদী ঐতিহ্যের নতুন জাগরণ। গোটা আলমে ইসলামী জুড়ে উঠেছে এক আওয়াজ–আফগান, আফগান! মুজাহিদীনে আফগান!!

সীসাঢালা প্রাচীর

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের পর সে দেশের তাওহীদী জনতাকে জান, মাল, দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করা এবং গোটা মুজাহিদ বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো কাফের-কমিউনিস্টদের মুকাবিলা করার পথে নেতৃত্ব দেয়ার কাজে যেসব দল ও নেতৃবৃন্দ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন, তন্মধ্যে আফগান মুজাহিদদের ইসলামী জোটভুক্ত প্রধান সাতটি দলের নাম উল্লেখযোগ্য। জোটভুক্ত দলগুলো হচ্ছে–

১. আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী। নেতাঃ আল-উস্তায আবদু রাব্বির রাসূল সাইয়াফ। জনাব সাইয়াফই "আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী লি মুজাহিদে আফগান"–সম্মিলিত ঐক্যজোটের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ও সফল নেতা। তাঁর সভাপতিত্বের আমলেই আফগান জিহাদের মূল বিজয়ের ধারা সূচিত হয়। কাবুল প্রদেশের পাঘমান জেলায় জন্মগ্রহণকারী এ মুজাহিদ নেতা কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্র্যাজুয়েশন করার পর মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে হাদীসের উপর ডক্টরেট করেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দাদাগিরি এবং সমাজতান্ত্রিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি হিসেবে পরিচিত উস্তায সাইয়াফ-এর কারাবরণ এবং ফাঁসির রশি হতে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার কাহিনী পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কারমাল সরকার কর্তৃক তাঁর মাথার দাম দেড় কোটি আফগানী মুদ্রা ঘোষণাও পাঠকদের জানা। জেল থেকে বেরিয়েই জিহাদে লেগেছিলেন। আজো পর্যন্ত ক্ষান্ত হননি সাইয়াফ। আফগান জিহাদে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সউদী সরকার বাদশাহ "ফয়সল" পুরস্কারে ভূষিত করেন। আবক্ষলম্বিত ঘন কালো দাড়ি, মাথায় বাঁধা পাগড়ী, গায়ে জোব্বা, আল্লাহর ভয়ে আনতদৃষ্টি ও নূরানী চেহারা দেখে বুঝার উপায় নেই যে, হাদীসবিশারদ এই আলেম ব্যক্তিটিকে আমেরিকা-রাশিয়াসহ দুনিয়ার সমস্ত বড়-ছোট-মাঝারি শয়তানগুলো কেন এতো ভয় পায়। তাঁর নাম শুনে কেন প্রকম্পিত হয় ক্রেমলিন, হোয়াইট হাউসের দরজা-জানালা ও ভিত-বুনিয়াদ?

২. আল-হিযবুল ইসলামী (হিযবে ইসলামী)। নেতাঃ ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ার। গুলবদন ফার্সী শব্দ। সারা আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ব্যক্তিটির নাম বদলে আরবরা এখন ডাকে ক্বালবুদ্দীন। যার অর্থ দাঁড়ায় "ইসলামের হৃৎপিণ্ড।" ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী এই মুজাহিদ নেতা ১৯৭৪ সালে কারারুদ্ধ হন। তারাকী বিরোধী অনেকগুলো সামরিক অভ্যুত্থান তিনিই সংগঠিত করেন। একসময় তিনি ছিলেন জোটের প্রধান। তাঁর দল আল-হিযবুল ইসলামীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার।

উল্লেখ্য যে, সাইয়াফ ও হিকমতইয়ার প্রথম হতেই এক চিন্তাধারার লোক। ইসলামের প্রশ্নে তাঁরা আপসহীন। খালেস ইসলামী শাসন ছাড়া তাঁরা আর কিছুই বুঝেন না। আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট, ইসলামের নামাবলী গায়ে দেয়া, রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের চৌকিদার, তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনকারীরা তাঁদের বড়ই না-পছন্দ করে থাকে। সুতরাং এ দুই নেতার প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই সমান নারাজ। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো তাঁদের 'মৌলবাদী' নামে স্মরণ করে থাকে। কিন্তু সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্ এবং আফগানিস্তানের ঈমানদার জনগণ এ দু'জনকেই সত্যিকারের মুজাহিদ নেতা ও ইসলামী জিহাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁদের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায়ই জিহাদ এগিয়ে চলছে সাফল্যের মন্‌যিলের দিকে।

৩. আল-জমিয়ত আল-ইসলামিয়া (জমিয়তে ইসলামী)। নেতাঃ অধ্যাপক বুরহানুদ্দীন রাব্বানী। তিনি আফগানিস্তানের বাদাখ্‌শানে জন্মগ্রহণ করেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পর তিনি আল-আযহার কায়রোতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ইখওয়ানের মুর্শিদে আ'ম শহীদ হাসানুল বান্না এবং জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা মওদুদী সাহেবের বই-পত্র তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে মনোযোগী করে। আফগান জিহাদে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রাব্বানী একজন কৃতী রাজনীতিবিদ ও শান্তিপ্রিয় মুজাহিদ নেতা।

৪. হিজবে ইসলামী (খালিস)। নেতাঃ মাওলানা ইউনুস খালিস। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত একজন প্রতিভাবান আল্লাহ্ওয়ালা আলেম। মুজাহিদ জোটের শরীআহ্ বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুজাহিদীনের প্রাণপ্রিয় নেতা ইউনুস খালিস খুবই শ্রদ্ধাভাজন এবং সর্বজনমান্য ব্যক্তি।

৫. হারকাতে ইনকিলাব-ই-ইসলামী। নেতাঃ মাওলানা মুহাম্মদ নবী। মাদ্রাসা শিক্ষিত একজন আলেম। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই মাওলানা ১৯৬৭ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। লাগোর শহরের এক মসজিদে ইমামতি করতেন তিনি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশের পর নিজের ভক্ত ও অনুরক্তদের নিয়ে লড়াই করছেন।

৬. মাহায-ই-মিল্লী। নেতাঃ সাইয়েদ আহমদ জিলানী। তিনি একজন তরীকতের পীর। তাঁর অনুসারীরা খুবই ধর্মপ্রাণ ও শরীঅতের পাবন্দ। রুশ আগ্রাসনের শুরুতেই তিনি নিজের মুরীদানসহ জিহাদে শরীক হন।

৭. জাবহা নাজাত-ই মিল্লী। নেতাঃ মাওলানা ছিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী। কাবুল এবং মিসরে ইসলামী শরীঅতের উপর শিক্ষা লাভ করেন। ডেনমার্ক, লিবিয়াসহ বিভিন্ন দেশে প্রবাসজীবন কাটান। ডেনমার্কে থাকতে ইমামতি করতেন। কর্ম-জীবনে এক সময় হাইস্কুলে শিক্ষকতাও করেন। জিহাদে তাঁর এবং তাঁর দলের ভূমিকা উজ্জ্বল।

দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের জিহাদের বিভিন্ন সময়ে এ "সাত দলীয় মুজাহিদ ঐক্যজোট" পরাশক্তিসমূহের এজেন্টদের কূট-কৌশলে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এক নেতার প্রতি অন্য নেতার হিংসা-দ্বেষ বা শত্রুতা সৃষ্টির জন্যে নামে-বেনামে ছাড়া হয়েছে বহু পুস্তিকা ও প্রচারপত্র। একবার বিভিন্ন সংগঠনের নকল প্যাড ছেপে জোট ভেঙ্গে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল কমিউনিস্টরা। এতে ২/৩ জন জোটভুক্ত নেতার মাঝে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলেও সাইয়াফ-হিকমতইয়ারের গতিশীল নেতৃত্ব এবং সর্বস্তরের উলামা, ইমাম ও আধুনিক শিক্ষিত মুজাহিদদের বিজ্ঞোচিত মতামতে দল, নেতা ও মতের উর্ধ্বে উঠে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ঐক্যজোটকে টিকিয়ে রেখেছেন। দুশমনদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করেই মুজাহিদ ঐক্যজোট বেঁচে রয়েছে।

একবার ২/৩ জন মুজাহিদ নেতা ইউরোপ সফরে গিয়ে আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ জহির শাহ্ ও তাঁর পরিবারবর্গের সাথে দেখা করে এসে অন্য সুরে কথা বলতে শুরু করেন এবং জার্মানীসহ আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের প্ররোচনায় তাঁরা একটি পাল্টা ঐক্যজোট গড়ারও ঘোষণা দেন। কিন্তু আফগানিস্তানের জিহাদপাগল জনগণ নতুন এই ঐক্যজোট বয়কট করে।

ইসলাম-দুশমনদের কোন ষড়যন্ত্রই জিহাদের গতিরোধ করতে পারেনি। ছিদ্র করতে পারেনি মুজাহিদদের সীসাঢালা প্রাচীর।

দৈনিক ২০০ কোটি টাকা

নয়-দশ বছরের জিহাদই রুশদের মনে এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিলো যে, "আফগানদের মৃত্যু নেই।" আর আফগান জনগণের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিলো যে, "রাশিয়ার অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আফগান মুজাহিদদের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না।" মুজাহিদদের মুখে শোনা অগণ্য অসংখ্য আজব ঘটনাবলী যখন সারা বিশ্বের মুসলিম অ-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক ও প্রতিবেদকের চোখ ছানাবড়া করে দিয়েছে, গোটা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে, আফগান মুজাহিদদের রক্তের আখরে লেখা বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য, অলৌকিক সব ঘটনাপ্রবাহ। তখন রুশ নেতৃবৃন্দ এ কথা ভালো করেই বুঝে নিয়েছেন যে, Atheism is an inseparable part of marxism (অর্থাৎ, নাস্তিক্যবাদ মার্ক্সবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ) হলেও আল্লাহ আসলে আছেন। আর তাই অসংখ্য সৈন্য, কমান্ডো ও অগণ্য সমরাস্ত্র হারিয়ে তারা দাঁতে আঙ্গুল কামড়াচ্ছিলেন। একজন কানাডীয় সাংবাদিকের ভাষায়ঃ "যুদ্ধের সব কিছুই একেকটা চরম বাস্তবতা, যার ব্যাখ্যা দিতে আমি অক্ষম। যুদ্ধে রাশিয়া প্রতিদিন ৪০ থেকে ৬০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।" (বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি।) শ্রদ্ধেয় পাঠক, এবার আপনিই দেখুন, ২০০ কোটি টাকা রোজ যদি রাশিয়ার ক্ষতি হয়, তবে দশ বছর যুদ্ধ চলার পর রাশিয়া সরকারের দেউলিয়া না হয়ে কি উপায় আছে?

সময় থাকতে মনা হুঁশিয়ার

"বাঘা আফগানদের পবিত্র দেশে নাস্তিক-খোদাদ্রোহী ও নাপাক কমিউনিস্টরা থাকতে পারবে না।" এ কথা বুঝে আসার সাথে সাথেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জাতশত্রু আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে ফেললো। গরবাচেভ-রাইসা ওয়াশিংটনে, রিগ্যান-ন্যান্সি মস্কোতে–মনে হয় যেন কতকালের বন্ধু তারা। কিন্তু ব্যাপার আরও জটিল।

রুশ-মার্কিনচক্র জানে যে, তাদের উভয়ের আওতার বাইরে যদি কোন একটা ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, তবে তাদের পরিণতিও ঐ দেড় হাজার বছর আগের

রোম ও পারস্যের মতোই হবে, যাদের সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদের সৌধ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল মদীনার মরুচারী লোকেরা। সুতরাং সময় থাকতে মনা হুঁশিয়ার।

দাবার শেষ চাল

রুশ নেতা মার্কিন নেতাকে বললেন, আফগানিস্তানের ব্যাপারে একটা মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে। সুতরাং আমেরিকা প্রস্তাব করলো, জহির শাহ্‌কে পুনরায় ক্ষমতায় বসিয়ে একটা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার শর্ত ছিল যে, সাইয়াফ-হিকমতইয়ারকে পথ থেকে সরাতে হবে এবং তাদের 'ইসলাম' কায়েম করা যাবে না। তবে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো 'মার্কিন ইসলাম' কায়েম হলে কোন আপত্তি নেই। সুতরাং ইটালীতে বসবাসকারী বাদশাহ্ জহির শাহের সাথে আমেরিকার বোঝাপড়া শুরু হয়ে গেলো। এ ক্ষেত্রে সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী কিছুটা নমনীয় হয়ে পড়লেন। যুদ্ধ শেষ করে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার করে আফগানিস্তানে জহির শাহ্‌কে ক্ষমতায় বসিয়ে 'আমেরিকান ইসলাম' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাগ্রত হিজাদপাগল আফগানিস্তানকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে দুই পরাশক্তির মধ্যকার সমঝোতা যখন পূর্ণতায় রূপ নিচ্ছে, তখনই ইটালীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জহির শাহ্ বললেনঃ "আফগানিস্তানের ক্ষমতা বুঝে নেয়ার জন্যে মুজাহিদরা আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন।"

আফগান মুজাহিদদের সাত দলীয় ঐক্যজোটের তৎকালীন চেয়ারম্যান, মুজাহিদ-সর্বাধিনায়ক মাওলানা সাইয়াফ তখন শাহের উক্তির জবাবে একটা ঘোষণাপত্র ছেড়ে ছিলেনঃ "স্বাগতম! বাদশাহ্ জহির। বিমান বন্দরেই নিহত হওয়ার শখ থাকলে দেশে আসুন।"

এরপর হতে আর জহির শাহের কোন্ রা' শব্দ শোনা যায়নি। রুশ-মার্কিন নেতারা এরপর কাবুলের কমিউনিস্ট সরকারের মাধ্যমে মুজাহিদদের সাথে একটা আপসরফার চেষ্টা চালাতে থাকেন। '৮৫ সালে বাবরাক কারমাল যে আপসনামা তৈরি করে, '৮৬-এর ৩০শে ডিসেম্বর পিডিপির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এবং '৮৭-এর ৩রা জানুয়ারী বিপ্লবী পরিষদের রিপোর্টে তার চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। এরপর নজীবুল্লাহ সরকার সে আপসষ-প্রস্তাবের রূপরেখা প্রকাশ করে। আপসষ করার জন্য কমিউনিস্ট সরকার নিম্নলিখিত প্রস্তাব দেয়ঃ ১. যুদ্ধবিরতি, ২. ক্ষমতা ভাগাভাগি করা, ৩. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, ৪. ইসলামের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ৫. নতুন সংবিধান প্রণয়ন।

জিহাদ-শাহাদাত-নয়তো বিজয়

মার খাওয়া আফগান জনগণ এখন বড় সজাগ হয়ে গিয়েছে। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় তারা এখন আর ভোলে না। যুদ্ধবিরতিতে না হয় কমিউনিস্টদের পরাণ বাঁচবে, কিন্তু ক্ষমতার ভাগাভাগি, এটা কী করে সম্ভব? একদিকে আবু বকর, উমর, আলী, খালেদ, সা'দ, আমর বিন আ'সের সন্তানরা, আর অন্য দিকে মার্ক্স, লেলিন, এঞ্জেল্স, স্টালিনের উত্তরসুরিরা। এমন আকাশ-পাতাল বৈষম্যপূর্ণ দুইটি শ্রেণী একই দেশে ক্ষমতায় গিয়ে কী করবে? আর সাধারণ ক্ষমা, সে তো এক বোকামি। কার অপরাধ কে ক্ষমা করে। কওমের, দ্বীন, ঈমান, ইতিহাস-ঐতিহ্যের গাদ্দাররা করবে দেশপ্রেমিক লড়াকুদের সাধারণ ক্ষমা–মন্দ না! ইসলামের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবে কমিউনিস্টরা! যারা একনম্বরে খোদার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না! ধর্ম ও নৈতিকতাকে মনে করে জনগণের জন্যে আফিম। মানবতাকে মনে করে অবদমন ও শোষণের হাতিয়ার। আফগানিস্তানে ৮০০ মসজিদ শহীদ করে যারা মেহনতী মানুষের মুক্তি আনার স্বপ্ন দেখেছে। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যারা কুরআন শরীফের উপর পায়খানা করেছে! নারীমুক্তির জন্যে যারা পর্দানশীন সম্ভ্রান্ত মহিলাদের বিবস্ত্র করে কাবুলের রাজপথে মেশিনগান হাতে দৌড়িয়েছে।

তারা করবে ইসলামের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আফগানিস্তানের ইমাম ও আলেমদের গাড়ীর সাথে বেঁধে যারা অসমতল পাহাড়ী রাস্তায় টানা-হেঁচড়া করে সমাজতন্ত্র কায়েম করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে মুসলমান তরুণীদের গাছের সাথে বেঁধে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে আধমরা দিগম্বরী তরুণীদের গায়ে বেয়নেট দিয়ে এঁকেছে রক্তের আল্পনা। সেই কমিউনিস্টরা করবে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। ভালোই তো! আর নয়া সংবিধান। তাও ক্ষমতা ভাগাভাগির মতোই সমস্যা। কারণ, দুধ আর গরুর মূত্র এক পাত্রে রাখা যায় না। যেমন রাখা যায় না শরাব আর শরবত। তেমনি ইসলাম ও কমিউনিজম এক সংবিধানে থাকতে পারে না। সুতরাং আপসরফার আশার গুড়ে বালি। মুজাহিদরা আফগান সরকার তথা দুই পরাশক্তির সম্মিলিত আপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে দিলেন, "জিহাদ-শাহাদাত-নয়াতা বিজয়।" ইসলাম ও কুফরের মধ্যে, আলো ও অন্ধকারের মধ্যে, দিন ও রাতের মধ্যে, মধু ও বিষের মধ্যে কোন আপস নেই, হতে পারে না। সুতরাং আমাদের এবং আফগান-সোভিয়েতের লাল ফৌজের মধ্যে মেশিনগান ও ক্লাসনিকোভই একমাত্র

ফয়সালা। আফগানিস্তানের মুসলিম মাটি থেকে সর্বশেষ রুশ সেনাটি পর্যন্ত তাড়িয়ে এবং দেশী কমিউনিস্টদের আখেরী সদস্যটিকে পর্যন্ত কবর দিয়ে তবে মুজাহিদরা ক্ষান্ত হবেন। এরপর জিহাদ ছড়িয়ে যাবে সারাটা দুনিয়ায়। মধ্য-এশিয়া, ইসলামী তুর্ক সাম্রাজ্য রুশ দখলমুক্ত করে এরপর লক্ষ্য হবে 'মস্কো'। আল্লাহ্ পাকের পাগলা ফৌজের অগ্রাভিযান রুখে কে? আফগানিস্তান তো এখন খোদায়ী সাহায্য ও বিজয়ের লীলাভূমি।

চলো চলো যুদ্ধে চলো

জিহাদের কঠিনতম দিনগুলো যতোই কাটছে আর আল্লাহর মদদের ফটকও ততোই উন্মোচিত হচ্ছে। প্রচণ্ড শীতে, বরফের লেপে ঢাকা পর্বতমালা–প্রবল তুষারপাত–খাদ্য-রসদ ও হাতিয়ারের অভাবজনিত অসুবিধাসমূহ সহ্য করে মুজাহিদরা যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন আফগান মুজাহিদদের ইসলামী ঐক্যজোটের প্রধান, মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবদু রাব্বির রাসূল সাইয়াফের প্রচেষ্টা ও ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ারের দূরদর্শিতায় সারা পৃথিবীর মুসলিম দেশসমুহ হতে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, রসদ-হাতিয়ার এবং জনশক্তি আফগান মুজাহিদদের জন্যে সরবরাহ করা শুরু হলো। সউদী আরব ও উপ-সাগরীয় দেশসমূহ এবং আফ্রিকার কতিপয় মুসলিম দেশ হতে সরকারী ও বে-সরকারীভাবে আসতে লাগলো সাহায্য। অত্যাধুনিক অস্ত্র কেনা হলো আমেরিকা ছাড়াও অন্যান্য ক'টা ইরোপীয় রাষ্ট্র থেকে। মুসলিম উলামা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসাররা সারা দুনিয়া থেকে ছুটে এলেন আফগানিস্তানের শিবিরগুলোতে। সবাই নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন ইসলামী জিহাদের বিশাল কর্মক্ষেত্রে। পাকিস্তান হতে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং সর্বস্তরের ইসলামপ্রিয় মানুষ গিয়ে শরীক হলো জিহাদে।

বাংলাদেশ-ভারত-বার্মা হতেও গেলেন অনেক ছাত্র-যুবক-জনতা। বাংলাদেশের বেশ ক'জন মাদ্রাসা ছাত্র হৃৎপিণ্ডের তপ্ত খুন ঢেলে দিয়ে সিক্ত করলো আফগান রণাঙ্গনের পাথুরে যমীন। আল্লাহর আফগান হতে শেষ হায়েনাটিকে পর্যন্ত তাড়ানোই এদের লক্ষ্য।

আফগান রণাঙ্গনে বাংলাদেশী মুজাহিদদের তৎপরতা

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ও দেশীয় কমিউনিস্ট বিরোধী লড়াইয়ে বাংলাদেশের প্রায় তিন হাজার মুজাহিদ অংশ নিয়েছে বলে হারকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ শাখার

ভারপ্রাপ্ত আমীর মুফতী শফীকুর রহমান জানান। আফগান জিহাদে শাহাদাতপ্রাপ্ত বাংলাদেশী মুজাহিদের সংখ্যা চব্বিশ। যুদ্ধাহত অনেক। উরগুন, খোস্ত, জালালাবাদ, কান্দাহার, গজনীসহ বেশ ক'টি প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গনে বাংলাদেশী মুজাহিদদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। খোস্ত রণাঙ্গনের প্রধান সিপাহসালার কমান্ডার খালেদ যুবায়ের শহীদ হওয়ার পর এ গুরুদায়িত্ব লাভ করেন সমকালীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী। দীর্ঘ প্রায় নয় দিন জিহাদরত থাকার পর তিনিও শাহাদাতবরণ করেন। গোটা আফগান জিহাদেই বাংলাদেশী যুবকেরা অসম সাহসিকতা ও সীমাহীন নিষ্ঠার পরিচয় দেন। শহীদ মাওলানা ফারুকীর পর কমান্ডার মনজুর হাসান, মুফতী আবদুল হাই, কমান্ডার আবদুস সালাম, মুফতী শফীকুর রহমান, আবু খালেদ, জাফর বিন কাসেম, আবু তারেক, আবদুল হাকীম, আলী আহমদ, চাচা বাসেত, মুক্তিযোদ্ধা হাকীম প্রমুখ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন খুব সফলভাবে। কমান্ডার ফারুক হাসান তাঁর জিহাদী অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি সুন্দর বই লিখেছেন। "আফগান রণাঙ্গন থেকে" নামের এ বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মুজাহিদদের উদ্যোগে ঢাকা থেকে একটি মাসিকও বের হয়। "জাগো মুজাহিদ" নামক এ পত্রিকাটি সারা দেশের জিহাদ-প্রিয় মানুষের মনে ব্যাপক উদ্দীপনা জাগিয়েছে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মুসলিম জাতির শৌর্য বীর্য আর গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা।

চাঁদ যতোদিন উঠবে সূর্য যতোদিন থাকবে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো সাহায্য ও নানা ধরনের সামরিক-সাংস্কৃতিক ও কল্যাণধর্মী সহযোগিতা মুজাহিদদের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং পাকিস্তানে আশ্রয়লাভকারী অসহায় ত্রিশ লক্ষ আফগান মুহাজিরের মেহমানদারী, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সব ধরনের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে পাকিস্তানের বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউল হক (রহঃ)-এর নাম ইতিহাসে সোনালী হরফে লেখা থাকবে। যতোদিন চাঁদ থাকবে, সূর্য উঠবে, ততোদিন প্রতিটি আফগান জনতার হৃদয়ফলকে উৎকীর্ণ থাকবে একটি বরকতময় নাম–'জিয়া'। মুসলিম উম্মাহর স্মৃতির ক্যানভাসে চিরদিন জ্বলজ্বল করবে এ পবিত্র নাম।

"আফগান জিহাদে বাংলাদেশী শহীদান"

ক্রঃ নং	নাম	জিলা	শাহাদাতের তারিখ	সেক্টর	কোন যুদ্ধে	কি ভাবে	দাফনের স্থান	জিহাদে অংশগ্রহণ
১।	শহীদ কামান্ডার মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী	যশোহর	১০/৫/১৯৮৯ইং	খোস্ত	লিজা পোস্ট	মাইন	খোস্ত	১৯৮৪
২।	শহীদ মাওলানা নূরুল করিম	যশোহর	১০/৫/১৯৮৯	খোস্ত	লিজা পোস্ট	বিস্ফোরণ	খোস্ত	১৯৮৭
৩।	শহীদ হাফেজ মতিউর রহমান	গাজীপুর	২৯/৯/৮৯	খোস্ত	শেখ মীর	মিসাইল	খোস্ত	১৯৮৮
৪।	শহীদ হাফেজ আব্দুল মোমেন	মোমেনশাহী	১৪/১/১৯৮৯	খোস্ত	মানি কান্ড	মাইন বিস্ফোরণ	খোস্ত	১৯৮৮
৫।	শহীদ মাওলানা কামরুজ্জামান	যশোহর	২৫/৫/ ১৯৮৫	গজনী	শেরানা	গুলিতে	শেরানো	১৯৮৫
৬।	শহীদ রায়হান উদ্দিন	গাজীপুর	২১/৯/১৯৮৯	জালালাবাদ	কোবাপাহাড়ী	গোলায়	তুরখম	১৯৮৮
৭।	শহীদ মাওলানা শেখ ইসমাইল	গাজীপুর	১৯৮৯	খোস্ত	গুরবজ	হ্যান্ডগ্রেনেড	মিরানশাহ	১৯৮৬
৮।	শহীদ মাওলানা আব্দুল মতিন	ফরিদপুর	১৯৮৯	জালালাবাদ	কোবাপাহাড়ী	গুলিতে	তুরখম	১৯৮৭
৯।	শহীদ বদরুল আলম	ফরিদপুর	১৯৮৯	খোস্ত	গুরবজ	হ্যান্ডগ্রেনেড	মিরানশাহ	১৯৮৮
১০।	শহীদ হাফেজ রহমতুল্লাহ্	ঢাকা	৩০/৯/১৯৮৮	উরগুন	জামাখোলা	মাইন বিস্ফোরণ	ঢাকা	১৯৮৮
১১।	শহীদ মাওলানা আব্দুল হামীদ	মোমেনশাহী	১৯৮৮	উরগুন	জামাখোলা	মাইন বিস্ফোরণ	উরগুন	১৯৮৬
১২।	শহীদ সাইফুল্লাহ	বরিশাল	২৩/২/১৯৮৯	খোস্ত	তুরগড়	মাইন বিস্ফোরণ	পেশোয়ার	১৯৮৭
১৩।	শহীদ মোশাররফ হুসাইন	কুমিল্লা	২২/২/১৯৮১	খোস্ত	জাহানদান	ট্যাংকের গোলা	খোস্ত	১৯৮৯
১৪।	শহীদ রবিউল্লাহ	ঢাকা	১৯৮৯	জালালাবাদ	খাইবারত	মাইন বিস্ফোরণ	পাব্বি	১৯৮৯
১৫।	শহীদ প্রফেসর রফিকুল্লাহ	নোয়াখালী	১৯৮৬	খোস্ত	রাগবেলী	গুলিতে	রাগবেলী	১৯৮৪
১৬।	শহীদ সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী	নোয়াখালী	১৯৮৬	খোস্ত	রাগবেলী	গুলিতে	রাগবেলী	১৯৮৬
১৭।	শহীদ মুফতি ওবায়দুল্লাহ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৯৯০	খোস্ত	শেখমীর	গুলিতে	বারী	১৯৮৭
১৮।	শহীদ নূরুল ইসলাম	হুগলী	১৯৮৮	খোস্ত	স্পেনকাই	মাইন বিস্ফোরণ		১৯৮৭
১৯।	শহীদ মোহাম্মদ ফারুক	খুলনা	১৯৮৮	কাবুল		মর্টারের গোলাতে		১৯৮৭
২০।	শহীদ আব্দুল্লাহ		১৯৮৬	হেরাত	জিন্দেজান	মাইন বিস্ফোরণ	জিন্দেজান	১৯৮৬
২১।	শহীদ নূরুল ইসলাম	বগুড়া	২০/১০/১৯৯১	গরদেজ	ছাতিকান্ড	মর্টারের গোলাতে	মিরানশাহ	১৯৯০
২২।	শহীদ ফয়জুল্লাহ	নোয়াখালী	১৯৯১	গরদেজ	ছাতিকান্ড	রকেট	মিরানশাহ	১৯৮৯
২৩।	শহীদ আব্দুল গফুর	চট্টগ্রাম	২০/১০/১৯৯১	গরদেজ	ছাতিকান্ড	মর্টারের গোলাতে	মিরানশাহ	১৯৮৯
২৪।	শহীদ মোহাম্মদ আলী	বরিশাল	৭/৪/১৯৯২	জালালাবাদ	সমরখেল	মর্টারের গোলাতে	তুরখম	১৯৮৭

না বলা কথা

'৮৭-এর এক অশুভ লগ্নে পাক-রাজধানী ইসলামাবাদের 'উজড়া' সামরিক ঘাঁটির অস্ত্রাগার বিস্ফোরিত হয়ে বহুসংখ্যক পাকিস্তানী নাগরিক প্রাণ হারায়। ইসলামাবাদ, পিন্ডির বহু মানুষ হতাহত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য বাড়ী-ঘর। সারা পাকিস্তান জুড়ে ওঠে কিয়ামতের মাতম। কারণ, উজড়ার বিরাট অঞ্চল জুড়ে মাটির তলায় রাখা মিসাইল-বোমা-রকেটসহ বিভিন্ন ঘুমন্ত মারণাস্ত্র হঠাৎ জেগে উঠলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, সরকারী লোকজন এবং সর্বস্তরের তাওহীদী জনতা এ ঘটনাটি বে-মালুম ভুলে যায়। উজড়া দুর্ঘটনার কোন তদন্ত বা হতাহতের কোনরূপ ক্ষতিপূরণ নিয়ে পাকিস্তানের মানুষ সেদিন তেমন উচ্চবাচ্য বা গণ্ডগোল করেনি। কারণ, তারা জানে যে, 'উজড়া' অস্ত্রাগার ও মারণাস্ত্রসম্ভার তাদের পড়শী আফগান ভাইদের জন্যে। সারা পৃথিবীর উন্নতমানের অত্যাধুনিক অস্ত্র কিনে পাকিস্তানে এনে 'উজড়া' অঞ্চলের মাটির নিচে রাখা হয়, আর রাতের অন্ধকারে P.I.B-এর গোয়েন্দারা বে-সামরিক ট্রাকে করে এসব অস্ত্র পৌঁছে দেয় পেশোয়ার সীমান্তের আফগান শরণার্থী শিবিরে। পাক সেনাবাহিনীকে এ কাজে ব্যবহার না করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে এ কাজটি করাতেন এ যুগের গাজী সালাহুদ্দীন শহীদ জিয়াউল হক। আর গোটা ব্যাপারটা তদারকের দায়িত্বে থাকতেন মরহুম লেফটেন্যান্ট জেনারেল আখতার আবদুর রহমান। মস্কো-দিল্লী ও কাবুলের যৌথ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায়ই ইসলামাবাদের উজড়া অঞ্চলের মাটির তলায় ঘুমানো মারণাস্ত্রগুলো গর্জে উঠেছিল সেদিন।

বিধ্বস্ত বিমান, অক্ষত কুরআন

১৯৮৮-এর শুরু হতেই যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হয়ে সৈন্য প্রত্যাহারের কথা তুললো, এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত হলো দুই পরাশক্তির মধ্যে বৈঠক। স্বাক্ষরিত হলো "জেনেভা চুক্তি।" এ সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ। আর তাদের সাথে সাথে সন্দিহান ছিলেন মরহুম জিয়া। সুতরাং জিয়া ছিলেন মুজাহিদদের স্বার্থের ব্যাপারে অনমনীয়। আর তাই তাঁকে শুনতে হলো বহু ধমক। দেখতে হলো চোখ রাঙ্গানি। মস্কো বললোঃ জিয়া! বেশি বাড়াবাড়ি করো না! কাবুল বললোঃ জিয়া জেনেভা চুক্তি ভঙ্গ করছে। ভারত

বললোঃ মুজাহিদদের বিজয় আমাদের জন্যে বিরাট এক হুমকি! ১৫ই অগস্ট '৮৮ ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লীর লালকেল্লায় আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে রাজীব গান্ধী ধমক দিয়ে বললেনঃ আফগান প্রশ্নে পাকিস্তানের বাড়াবাড়ির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে!

এসব হিরিম তিরিম-ধমক-ধামকের ক'দিন পরেই পাকিস্তানের ইসলাম-প্রিয় প্রেসিডেন্ট, মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী ও নির্ভরযোগ্য নেতা, মুহাম্মদ জিয়াউল হক ২৯ জন বড় বড় আর্মি অফিসার ও সরকারী কর্মকর্তাসহ ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা বাহওয়ালপুরের আকাশে শহীদ হলেন। বিমানে লুকিয়ে রাখা বোমা অথবা মাটি থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের আঘাতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্রটিমুক্ত তাঁর সি ১৩০ সামরিক বিমানটি চুরমার হয়ে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়ার কুরআন শরীফখানি থাকে সম্পূর্ণ অক্ষত। লেঃ জেনারেল আখতার আবদুর রহমানও এই বিমানে ছিলেন।

জিয়াকে শেষ করে দিলেও জিহাদের আগুন নেভানো যাবে না। কুরআনের একজন সৈনিককে টুকরো টুকরো করে ফেললেও কুরআনকে মিটিয়ে দেয়া যায় না, লক্ষ আফগান মুজাহিদের মরণজয়ী কাফেলা এক জিয়ার অভাবে স্তম্ভিত-কম্পিত হবে না। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ, ইসলামাবাদের শাহ্ ফয়সল মসজিদের সম্মুখস্থ চত্বরে কবরের পাশে রাখা জিয়ার লাশের কাছে দাঁড়িয়ে ছয় শত আফগান মুজাহিদ প্রতিনিধি এ কথাই উচ্চারণ করে গিয়েছেনঃ জিয়া একজন মুজাহিদ। তিনি আমাদের সহযোদ্ধা। আফগান কমিউনিস্ট গোয়েন্দা সংস্থা 'খাদ', ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র', সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কে.জি.বি এ হত্যাকাণ্ডের সম্ভাব্য নায়ক। আমরা শহীদ জিয়া হত্যার বদলা নেবো। রণাঙ্গনে ফিরে গিয়েই মুজাহিদরা বিশেষ এক বাহিনীকে দায়িত্ব দিয়েছেন শহীদ জিয়া হত্যার প্রতিশোধের লক্ষ্যে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে। যারা দ্বীনি জিহাদের বিজয়কে থামিয়ে দিতে ব্যক্তিকে হত্যা করে, তারা জানে না যে, ইসলামী জিহাদ কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয়।

শহীদ জিয়ার দু'টি স্বপ্ন

পাকিস্তানের ধর্মমন্ত্রী মাওলানা ওয়াসে মাজহার নদভী জিয়াউল হকের শাহাদাতের পর বলেছিলেনঃ মরহুম জিয়ার দু'টো স্বপ্ন ছিলো। যার একটি

বাস্তবায়িত হলেও অন্যটি হয়নি। জিয়া আল্লাহর কাছে দো'আ করতেনঃ আয় আল্লাহ্! আমার যেন শহীদী মওত হয়; আর মৃত্যুর সময় যেন আমার পরনে থাকে সৈনিকের পোশাক। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার সময় তাঁর গায়ে সামরিক উর্দি ছিল। আর মৃত্যুর তিন দিন আগে পাকিস্তানের আযাদী দিবসে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি তাঁর দেশে পরিপূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েমের ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। এছাড়া আফগান জিহাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে থাকার কারণেই কাফের কমিউনিস্ট ও মুশরিকদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে তিনি শহীদী জামাতে শামিল হন।

অন্য যে স্বপ্নটি তাঁর বাস্তবায়িত হয়নি, সেটি হলো, তিনি বলতেন যে, মুজাহিদদের আফগান থেকে যেদিন রাশান কমিউনিস্টদের শেষ সৈন্যটিও চলে যেতে বাধ্য হবে, যেদিন স্বদেশী কমিউনিস্টদের শেষ গাদ্দারটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সেদিন আমি স্বাধীন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের জামে মসজিদে নামায আদায় করবো। কিন্তু শহীদ জিয়া সে কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের লাল সূর্যোদয়টি দেখে যেতে পারেননি। ইসলামী প্রজাতন্ত্র আফগানের রাজধানীতে মহান স্রষ্টার সামনে সিজদাবনত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। এ স্বপ্নটা তাঁর স্বপ্নই রয়ে গেলো।

আফগান মুজাহিদদের সাত দলীয় ঐক্যজোট নেতা বলেছেনঃ আফগান মুজাহিদদের সহযোদ্ধা, শহীদ জিয়ার নামে কাবুলে একটি বিশাল জামে মসজিদ স্থাপন করা হবে ইন্‌শাল্লাহ্। কবরেও তাঁর রূহ শান্তি পাবে, বাস্তবায়িত স্বপ্ন দেখে উৎফুল্ল হবে তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণ।

জিহাদের দেশে বাংলাদেশী উলামা ও বুদ্ধিজীবী

মার্চ '৮৮ তে বাংলাদেশের বিশিষ্ট উলামা ও মাশায়েখদের দশ সদস্যের একটি দল আফগান মুজাহিদদের দেখতে যান। তন্মধ্যে বেশ ক'জনের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁদের চোখে দেখা অবস্থা ও জিহাদের মাটিতে পা দেয়ার অনুভূতি সম্পর্কে তাঁদের দু'একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি।

বিশিষ্ট আলেম, খ্যাতনামা ওয়ায়েজ, মাওলানা, হাবীবুল্লাহ মিসবাহ বলেনঃ সারাজীবন কুরআন-কিতাবে পড়েছি, জিহাদ-জিহাদ-জিহাদ। কিন্তু আফগানিস্তানে গিয়ে দেখেছি জিহাদ কি জিনিস। ইসলামের স্বর্ণযুগের চিত্র যেন এই আফগান

মুজাহিদরা। পাহাড়ের গুহায়, মাটির নিচের সেনানিবাসে দেখা যায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিস্ফুটন। চলছে নামায, চলছে যিকির-দোআ-তাসবীহ-তালীম। একদিকে হাদীসের দরস, অন্যদিকে তাযকিয়া ও ইহসানের তালকীন। একদিকে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা, অন্যদিকে টা-টা-টা-দ্রিম ফায়ারের শব্দ। সামরিক ট্রেনিং। ঘরের একপাশে কেতাবের ভাণ্ডার, অন্যদিকে অস্ত্রের স্তূপ। জীবন্ত একটি ইসলামী সমাজ। ফরয-সুন্নত মুস্তাহাবওয়ালা লোকজন যেন একেকটা এটম বোম।

খ্যাতনামা আরবীবিদ, বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কারক, চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক বলেনঃ আরব যুবকেরা এখন তাদের গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে লন্ডন-প্যারিস বা ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর না গিয়ে চলে আসেন মুসলিম উম্মাহর বসন্ত কানন আফগানে। সউদী আরবের ধনকুবের পিতার মিলিয়নিয়র সন্তান উসামাহ্ বিন লাদেনকে দেখেছি মুজাহিদদের নিয়ে ব্যস্ত। এক ব্যক্তির সাথে কথা হলো, জিহাদে আসতে বাধা দেয়ায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে চলে এসেছেন সাথে দুটো শিশু পুত্র নিয়ে। বাড়ী তাঁর আরব দেশে।

আফগান মুজাহিদদের ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষার জন্যে খোলা হয়েছে বহুসংখ্যক কিন্ডারগার্টেন স্কুল, কলেজ ও ক্যাডেট একাডেমী। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ আর ক্যান্টনমেন্ট এখন একাকার হয়ে গেছে। একটি কিন্ডার, গার্টেনে আমরা গেলাম, আফগান সিংহের বাচ্চারা সামরিক কায়দায় সালাম জানালো আমাদের। শোনালো একটি জিহাদী সঙ্গীত। পশতু ভাষার এ গানটি আমার কানে অহর্নিশ বাজতে থাকে। আফগান মুজাহিদদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্ ও মুজাহিদদের সর্বাধিনায়ক শায়খ সাইয়াফসহ আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আমরা দেখা করি। দু'একটি মুজাহিদ সমাবেশে আমাকে বক্তব্যও রাখতে হয়। আফগান জিহাদ উম্মতের জন্যে মহামুক্তির সোনালী রাজপথ। হযরত মাওলানা যওক সাহেব তাঁর আফগান সফরের উপর একটি বই লিখেছেন যা আরবী ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। "রিহলাতী ইলা আরদিল জিহাদ" নামক বইটি বিশ্বমুসলিম মানসে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করবে বলে আমার ধারণা।

হযরত মাওলানার বইটি বাংলায় তরজমা করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হলে "দেখে এলাম জেহাদ ভূমি" নামে এর বাংলা সংস্করণ বের হয়। আমার অনূদিত

এ বইয়ের একাংশ প্রিয় পাঠককে উপহার দেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও মুরুব্বী মাওলানা সুলতান যওক সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুর ভাষায়ঃ

আফগান রণক্ষেত্রে আমাদের সফর

৮ই রজব ১৪০৮ হিজরী মোতাবেক ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ তারিখে আমি এবং আমার সফরসঙ্গী ঢাকার উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। ঢাকায় গিয়ে যখন পাক-আফগান সফরের সাথীদের সাথে মিললাম, দেখি, প্রতিনিধিদলে আমাকে রাখতে তাদের আগ্রহের অন্ত নেই। ২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সফরের দিন ঠিক হলেও বাংলাদেশ বিমানের অব্যবস্থাপনা ও গাফলতির দরুন তারিখ পিছিয়ে গেলো। অতএব, ২রা মার্চ বুধবার সকাল ৯টায় আমরা পাকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। করাচী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যখন আমাদের বিমানটি ল্যান্ড করলো, তখন দুপুর ১টা। আর পাকিস্তানে তখন ১২টা বেজেছে। বিমানের বাইরে আসতেই দেখতে পেলাম চারদিক আলো করা হাস্যোজ্জ্বল অনেকগুলো চেনা মুখ। পাকিস্তান প্রবাসী বাংলাদেশী আলেম-উলামা, ছাত্র-যুবক, ঐদেশী পরিচিতজন ছাড়াও আমাদের আমন্ত্রণকারী 'হারকাতুল জিহাদের' সদস্যরা এসেছেন প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানাতে। প্রায় শ'দুয়েক অভ্যর্থনাকারীর মাঝে রাশেদ, হারুন, সুলায়মান, আমার ছোট ভাই তাহের কাওসার ছাড়াও আমার বহুসংখ্যক ছাত্রও ছিল। প্রীতি-সৌহার্দ্য আর উষ্ণ ভালোবাসা নিয়ে চলতে লাগলো মুসাফাহা মু'আনাকা পর্ব। শ্রদ্ধা-সম্প্রীতির সুতায় গাঁথা বিচিত্র ফুলের মালা গলা উপচে এবার আমাদের মাথায় ওঠার পালা। বিগত জীবনে সফর আমি বহুবার করেছি, কিন্তু এবারকার মতো শ্রদ্ধা-প্রীতি ও ভালোবাসার ঝলক, উষ্ণ অভ্যর্থনার হৃদ্যতাপূর্ণ পরশ আর পাইনি। প্রথমতঃ আমাদের নিয়ে গাড়ীর বহর ছুটে চললো হারকাতের করাচীস্থ দফতরের দিকে। শুভেচ্ছা বিনিময় ও চেনা জানার পর সবাই একটু জিরিয়ে নিলাম। খাওয়া-দাওয়া সারতে না সারতেই খবর এলো, চারটা বাজেই ইসলামাবাদের উদ্দেশে উড়াল দিতে হবে।

একটু পরেই ছুটলাম এয়ারপোর্টে। পথে শায়খ হাকীম আখতার সাহেবের খানকাহে আশরাফিয়ার মসজিদে যোহর পড়লাম। সৌভাগ্যক্রমে হাকীম সাহেবের শায়খ হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রাহঃ)-এর খলীফা হযরত মাওলানা

আবরারুল হক সাহেবের সাথে দেখা হয়ে গেলো। ভারতের হরদুই শরীফের হযরত তাঁর পাকিস্তানী ভক্ত ও মুরীদানের আগ্রহে তখন করাচীতে অবস্থান করছিলেন।

এই মহান মুর্শিদের সান্নিধ্যে আমরা পনেরো মিনিট কাটালাম। হযরত মাওলানা হাকীম আখতার সাহেবের সাথে তো কথা বলারই সময় পাইনি। তাঁর সাথে আমার দীর্ঘদিনের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। হুযুর আমাকে বড়ই মহব্বত করেন। হাকীম সাহেব বারবার আবার সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ আর হয়ে উঠলো না। হায়! একটু যদি সময় পেতাম! শায়খ আবরারুল হক সাহেব (আল্লাহ তাঁর হায়াত দারাজ করুন)-এর বেশ কিছু মূল্যবান বই-পুস্তক আমাদের দেয়া হলো। বিপদাপদ মুসীবত হতে বাঁচার জন্যে ফজর ও মাগরিবের পর সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস আমাদেরকে তিনবার করে পড়তে বললেন তিনি। আমাদের প্রতিনিধি দলটিকে খানকার গেইট পর্যন্ত এসে হযরত যখন বিদায় দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের জন্যে, আমাদের দেশ ও জাতির জন্যে হাত তুলে মুনাজাত করলেন তিনি। এরপর আমরা সরাসরি বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। বিকেল চারটায় বিমান করাচীর আকাশে ডানা মেলে মাগরিবের একটু আগে গিয়ে ইসলামাবাদে নামলো। এয়ারপোর্টের পাশের মসজিদে জামাতের সাথে মাগরিব পড়লাম আমরা।

ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে আমাদের ইস্তেকবাল করতে এসেছিলেন হারকাতুল জিহাদের প্রধান মুজাহিদ ভাই কারী সাইফুল্লাহ আখতার এবং মুজাহিদ ভাই আবদুর রহমান যশোরী। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় হিসেবে পরিচিত হলেও মুজাহিদ আবদুর রহমান মূলতঃ ভারতীয় নন। যশোর জেলার মনিরামপুরের এই যুবক দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়তেন। জিহাদের আবেগ নিয়ে তিনি ভারত থেকে পাকিস্তানের পেশোয়ার গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর লেগে যান আফগান জিহাদের রক্তাক্ত খেলায়। দীর্ঘ চার বছরে বহুসংখ্যক লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন আবদুর রহমান।

(বিগত ১১ই মে '৮৯ আফগানিস্তানের খোস্ত রণাঙ্গনে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। হারকাতুল জিহাদের চীফ কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান যশোরী বাংলাদেশের গৌরব।)

মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার আমাদের জন্যে একটি গাড়ী ঠিক করলেন। তাঁর সাথে আনা প্রাইভেট কারটি তিনি নিজেই চালাচ্ছিলেন। আমাদের নিয়ে গাড়ী দুটো 'হিজরত পল্লীর' দিকে ছুটে চললো। পাপ্পি অঞ্চলের আফগান শরণার্থী শিবিরগুলোর বিশাল এলাকাকে 'হাইয়ুল হিজরাত' বলা হয়। পশ্‌তু ভাষায় এর নাম 'হিজরত কলে'। রাতের বেলা আমরা হিজরত পল্লীতে পৌঁছলাম। এ'শা পড়ে খানা খেলাম। মুহাজির পল্লীর পৌরসভা ভবনে আমাদের সুন্দর রাতটি কেটে গেলো।

৩রা মার্চ '৮৮-এর ফজর পড়লাম মুহাজির পল্লীর বিশাল মসজিদে। মসজিদের ভেতর-বাইরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পাঁচ হাজার মুসল্লী নামায আদায় করতে পারেন। মসজিদটি দেখলাম আফগান মুজাহিদে ভর্তি। সুদান বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার ডিগ্রীধারী, দাওয়াত ফেকাল্টির ডীন অধ্যাপক ক্বারী নাযীফ এ মসজিদের ইমাম। ইমাম সাহেব কুরআন শরীফের জিহাদী আয়াতগুলোই নামাযে পড়েন। এতে মুমিন হৃদয় আপ্লুত হয়, আল্লাহর পথে লড়াইয়ের আবেগে প্রকম্পিত হয়, হৃদয়-চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর ধারা–ইমাম সাহেবের হৃদয়হরা পাগলকরা তিলাওয়াতে। তিনি পড়েছিলেনঃ হে নবী, ঈমানদারদেরকে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা দিন। যদি তাদের ধৈর্যশীল বিশ জন হয় তবে দু'শ' জনের উপর এরা বিজয়ী হবে। আর যদি এরা দু'শ'জন হয়, তবে কাফেরদের এক হাজারের উপর এরা বিজয়ী হবে। কারণ, (অবিশ্বাসীরা) ওরা তো একটা নির্বোধ জাতি।-(আনফাল-১০)

সকালে নাস্তার দস্তরখানে পরিচয় হলো আরব্য শায়খ মুহাম্মদ শরীফ যয়বেক-এর সাথে। মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুশ্‌শরীআর ডিগ্রীধারী অধ্যাপক শরীফ অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্টি-মধুর আচরণে নিজেই নিজের উদাহরণ। ১৬ বছর তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। অবসর জীবনটা এখন কাটাচ্ছেন দাওয়াত ও জিহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করে। তাঁর ছেলে 'ইহসান' যুদ্ধে নাম লিখিয়ে মিশে গেছে মুজাহিদদের সাথে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াসিরের সাথেও এখানেই পরিচয়। ১৯৭৯ সালে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙ্গানো এই মুজাহিদ, আজকের অন্তর্বর্তীকালীন আফগান সরকারের আইনমন্ত্রী, মুহাজির পল্লীতে তিনিই আমাদের মেজবান। এছাড়া পাপ্পি

হিজরত কলেতে আমাদের অতিথিশালার দায়িত্বে ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা যুবক অধ্যাপক যাকারিয়া কাবুল হতে স্নাতক এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ হতে মাস্টার ডিগ্রীধারী। আফগান মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় সামরিক মজলিসে শুরার সদস্য শায়খ গুল আকবর এবং অন্যরা আতিথেয়তার হৃদ্যতাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এরা সবাই বীর আফগান মুজাহিদ এবং পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী আফগান জনগণের নেতা। যাদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ লাখের মতো।

শহীদের সমাধিতে...

নাস্তার পর অধ্যাপক ইয়াসির আমাদের মুহাজির পল্লী, আফগান শরণার্থী শিবির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হাসপাতাল ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখান। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন। হাসি মুখো এই অধ্যাপক অনর্গল আরবী বলেন। সর্বপ্রথমে শহীদানের অন্তিম শয্যায় তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন। শহীদ ইয়াহ্ইয়ার রক্ত আমি–নিজের হাতে নিয়ে শুঁকেছি–মিশকের সুবাস পেয়েছি ওর রক্তে–কথা কটি বলতে যেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন অধ্যাপক ইয়াসির। তিনি আমাদের বললেনঃ জিদ্দা থেকে শহীদ ইয়াহ্ইয়ার এক বন্ধু ফাহদ বায়ুমী এখানে এসে ইয়াহ্ইয়ার কবর খুঁজতে লাগলো, কিন্তু সে তো আর চিনে না। আর জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার মতোও কাউকে না পেয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কবরস্থানের পাশের ছায়ায় গা এলিয়ে দিলো। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখল যে, ইয়াহ্ইয়া সনযুরী তার কবর থেকে উঠে এসেছে, মাথায় তার ঝিকমিক করছে একটি আলোকোজ্জ্বল মুকুট। শহীদ ইয়াহ্ইয়া এসে ওর সাথে মুসাফাহা করে কিছুক্ষণ তার বন্ধুর পাশে বসলো। অতঃপর দু'একটি উপদেশ দিয়ে আবার কবরে চলে গেলো। এই পর্যটক (ফাহদ) ঘুম হতে উঠেই চলে এলো মুহাজির পল্লীতে। আমাদের সাথে দেখা করে বললোঃ আপনারা কি আমাকে ইয়াহ্ইয়ার মাযারটি চিনিয়ে দেবেন? আমরা বললামঃ হাঁ। যখন ফাহদকে সঙ্গে নিয়ে আমরা শহীদী গোরস্থানে এলাম তখন সে বললোঃ যে আমি আপনাদেরকে আমার বন্ধুর সমাধি দেখাই। আপনারা বলবেন ঠিক হলো না ভুল। অতঃপর সে আমাদের সঠিক কবরটিই দেখিয়ে দিলো। আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ ওহে ভিন্‌দেশী মুসাফির! কী করে তুমি চিনলে এ কবর? তখন সে তার স্বপ্ন-কাহিনীটি আমাদের খুলে বললো।

আফগান জিহাদের জন্যে রাসূল খোদা (সাঃ)-এর প্রস্তুতি

অধ্যাপক ইয়াসির আমাদের বললেন যে, এই কবরস্থানেই শুয়ে আছেন ফিলিস্তিনী নাগরিক শহীদ আহমদ সাঈদ। এই শহীদের বিস্ময়কর ঘটনাটিও আমরা শুনলাম। শহীদ আহমদ সাঈদ হজ্জ করতে গিয়ে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সশস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধে গমনে উদ্যত দেখতে পান। সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত রাসূলে মকবুল (সাঃ) কে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কোথায় চলেছেন? হুযুর (সাঃ) উত্তরে বললেনঃ আফগানিস্তানে যাচ্ছি। ঘুম হতে উঠেই আহমদ সাঈদ জিহাদের প্রতিজ্ঞা করে আফগানিস্তান চলে এলেন এবং সোভিয়েত সৈন্য ও কমিউনিস্টদের সাথে লড়াই করে শাহাদাতের পিয়ালা মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের মতো। তাঁর শাহাদাতলাভের দু'দিন পর আমরা তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে খবর দিলাম আমেরিকায়। তাঁর কোন কোন আত্মীয়-বন্ধু কবর যিয়ারতেও এসেছিলেন।

সীমান্ত রক্ষীকে দেয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুসংবাদ

অধ্যাপক ইয়াসির আমাদের শুনিয়েছেন যে, আলজিরিয়ার নাগরিক আবু আবদুল হাই পেশোয়ারে প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। স্বপ্নযোগে রাসূলে খোদা (সাঃ) তাঁকে সুসংবাদসহ একটা কাগজ দিলেন। এতে লেখা ছিলঃ "ওহে আবু আবদুল হাই, তুমি শহীদ।" ঃ হুযুর আমি কী করে শহীদ হবো? আমি তো পেশোয়ারে রয়েছি। আবু আবদুল হাই জিজ্ঞেস করলেন। হযরত নবীয়ে করীম বললেনঃ হাঁ তুমি সীমান্তরক্ষী প্রহরী বটে, তবে তুমি শহীদও।" পরবর্তী সময় দুশমনের মুখোমুখি হয়ে এই লোক শহীদী মওতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।

জিহাদের রং মাখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

শহীদী কবরগাহের মাটি চোখের পানিতে ভিজিয়ে, শহীদানের অমর আত্মার জন্যে রহমত কামনা করে, এদিনই আমাদের নিয়ে অধ্যাপক ইয়াসির ও তাঁর সঙ্গীরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলেন। "হেরা ইসলামী ইনস্টিটিউট" নামক মুহাজির ক্যাম্পের এ প্রতিষ্ঠানটি ক'জন আরব ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয়।

ক্লাস রুমগুলোতে আমরা ক'জন শিক্ষকের সাথে মিলিত হয়েছি। তন্মধ্যে অধ্যাপক আবদুল গাফফার বললেন, তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। সুদানী অধ্যাপক আবদুল হাফীজ সুদান ভার্সিটিতে পড়েছেন। গেলো বছর আফগান জিহাদে শরীক হয়েছেন তিনি। মিসরীয় অধ্যাপক আসেম কায়রোস্থ দারুল উলুম হতে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে পাঁচ বছর ইয়েমেনে শিক্ষকতা করেছেন। ছয় মাস আগে এসেছেন জিহাদে অংশ নিতে। এছাড়াও আমরা কথা বলেছি অধ্যাপক ইসমাঈল মুহাম্মদ মিসরীর সঙ্গে। তিনি মিসরস্থ সুয়েজ খাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন।

সাহাবাদের নামে শ্রেণীকক্ষের নামকরণ

ঐতিহাসিক হেরা গুহার নামানুসারে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটিতে একটা জিনিস আমাদের বড় ভালো লেগেছে। তা হলো, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি শ্রেণীকক্ষই সাহাবীদের নামের সাথে সম্পর্কিত। যেমনঃ আবু বকর শ্রেণী, উমর ইবনুল খাত্তাব শ্রেণী, হামযা নিকেতন, যুবায়র ইবনুল আওয়াম নিকেতন ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি ও পাঠ্যক্রম খুবই সুন্দর আর অভিনব। ক্লাসগুলোতে দেখতে পেলাম ছোট শিশুরা আরবীতে কথা বলছে, লিখছে। এরা কালাম-ই-ইলাহী থেকে ক'খানা সূরা আমাদের পড়ে শুনিয়েছে। বেশ কিছু ছাত্র একদম আরব্য ভঙ্গিমায়-রাগিনীতে ঈমান ও জিহাদী চেতনাসম্পন্ন কিছু সঙ্গীত পরিবেশন করলো। আর কেউ কেউ আমাদের সংবর্ধনা দিতে গিয়ে গাইলো স্বাগত সঙ্গীত। কচি কচি শিশুর কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হচ্ছিলোঃ

স্বাগতম, হে অভ্যাগত স্বাগতম!
আগমনে তব সুরভিত মোদের স্থান,
পবিত্রতম বিশ্বাসে ঝুঁকে গেছে হৃদয়-মন।
আত্মিকতার সৌরভে গেছে ছেয়ে
জ্ঞানের ভুবনে এতো সুদৃঢ় চূড়া, উঁচু মিনার।
আলোকময় প্রদীপ হিদায়েতের
স্বাগতম হে, ভুবন মোদের ভরা সৌরভে আজ–
গীত-সঙ্গীত নিয়ে এলো যেন পুবাল সমীরণ।
পরিবেশ তো মোদের দ্বীনের, লালন ভূমি

হে অতিথি, স্বাগতম!
আমরা তরুণ, দ্বীন মোদের জাতির পথের দিশা
মনোজগতে ঐক্য এনে দেয় কুরআনের তিলাওয়াত,
হিদায়েত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার লক্ষ্য মোদের
হে অতিথি–স্বাগতম, তব আগমনে।

আমাদের তারা মোহনীয় কণ্ঠে আরেকটি তারানা শোনালো, যা ছিল জিহাদের জযবা মিশ্রিত। (আরবী হতে ভাষান্তরিত রূপ)

ঃ সাল্লাল্লাহু আলা মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,
নিশ্চয় ইসলাম পরাক্রমকে বলে
শৃংখলা ও ভ্রাতৃত্বকে বলে
আর বলে মুহাম্মদের অনুসরণকে
সাল্লা...

এ তারানাটির সফল-সুন্দর একটা বর্ধিত এবং পরিবর্তিত রূপও আমরা শুনলাম।

নিঃসন্দেহে ইসলাম সত্য,
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কথা এনো না মুখে
এদের মাঝে নেই কোন ফারাক
এই তো মুহাম্মদের দ্বীন,
সাল্লা...
নিঃসন্দেহে ইসলাম, উপাদেয়
এতো বোমা আর ট্যাংক
এতো রণাঙ্গনে পা জমানো
সাহায্য কর মুহাম্মদের দ্বীনকে
সাল্লাল্লাহু ...
নেই কোন ভাঙ্গন ইসলামে
মুনাফিক তো মোদের লোক নয়
ভাঙ্গন যাদের কাম্য, তাদের লোক নয়
ভাঙ্গন যাদের কাম্য, তাদের শায়েস্তা কর

প্রমাণ দাও মুহাম্মদের মহব্বতের
সাল্লা
মসজিদে আক্সা ডাকছে ঐ,
জিহাদের দিকে চল ছুটে
প্রতিটি উপত্যকা আর ময়দানে ঘোষণা করে দাও–
আমরা মুহাম্মদের সৈনিক
সাল্লা ...
(লেখক কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তিত)

ওখানে আমরা বেশ কিছু শিশু-কিশোর দেখতে পেলাম যারা শহীদানের সন্তান। এখানে তারা দ্বীনী শিক্ষা লাভ করছে আর হৃদয়ে লালন করছে তাদের শহীদ পিতাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়পূর্ণ আবেগ। যারা ইসলাম ও মাতৃভূমির জন্যে ঢেলে দিয়েছেন হৃৎপিণ্ডের তাজা তপ্ত খুন। প্রতিষ্ঠানটির দেয়ালে দেখেছি বহু পোস্টার ও ফলক। যেগুলোতে লিখে রাখা হয়েছে অনেক চিরন্তন বাণী, স্বর্ণালী উক্তি এবং অমূল্য উপদেশমালা।

এর মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসটিও রয়েছেঃ "জাহান্নামের আগুন সে দুটো চোখকে স্পর্শ করবে না, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে, আর যে চোখ আল্লাহর পথে প্রহরায় জেগে থাকে।"-(ইবনে আব্বাস/তিরমিযী)

আর রয়েছে শহীদ ইমাম হাসান আল-বান্নার বাণীঃ "পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, যখন আযান শোন, সালাতের জন্যে উঠে পড়বে।"

এমনিভাবে শহীদ বান্নার এ উক্তিটিও লিখা আছে দেয়ালের গায়েঃ "বিগত দিনের স্বপ্ন আজকের বাস্তবতা আর আজকের স্বপ্নই আগামী দিনের বাস্তব।"

আমরা সীমাহীন আনন্দিত হয়েছি এটা দেখে যে, ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপ, সেকশন ও সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে ইসলামের ঐতিহাসিক যুদ্ধের দিনগুলোর নামানুসারে। যেমনঃ খন্দক গ্রুপ, তাবুক সেকশন, উহুদ পরিবার ইত্যাদি।

এরপর আমরা গেলাম একাডেমী দেখতে। একাডেমীর পরিচালক জনাব মুহাম্মদ রফীক এবং কমান্ডার আলম গুল নাসেরী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। নমুনা হিসেবে আমাদেরকে বেশ কিছু সামরিক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও কুচকাওয়াজ দেখানো হলো। কয়েকটি শ্রেণীকক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে

আমাদের সাক্ষাৎ ও আলাপ হলো। বিদায়ের আগ মুহূর্তে একাডেমীর চত্বরে ছাত্রদের একটি দল মাইক্রোফোনে গেয়ে শোনালো একটি বিপ্লবী জিহাদী সঙ্গীত। 'হানযালা সঙ্গীত' নামক এ গীতি নকশাটি ছিল পশতু ভাষায়। আরবী ও ফার্সী ভাষার দু'একটি শব্দ ছাড়া বাকী গানটুকুর অর্থ আমাদের বুঝে না আসলেও আফগান সিংহ শাবকদের হৃদয়ভরা আবেগময় কণ্ঠ আমাদের চেতনায় স্পন্দন জাগিয়েছে, ঝংকার তুলেছে হৃদয় বীণার তারে। এ সঙ্গীতটির প্রথম দুটো কলিঃ

দুরুমী হানযালা ফাতেকী গেনা কাবী,
সুমুর বেহতরীন দিচি রাখালি জানাযা কাবী।

পশতু ভাষার বিপ্লবী সঙ্গীতটিকে আরবীতে অনুবাদ করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইয়াসিরের কাছে প্রস্তাব রাখলাম। তিনি তখন বুঝিয়ে দিলেন এর আরবী অর্থঃ

"শান্ত মনে চলেছেন হানযালা জিহাদের ময়দানে। রাসূলে খোদা (সাঃ) পড়াবেন তাঁর জানাযার নামায। কতোই না মজার ব্যাপার! তাঁকে গোসল দিতে আকাশ হতে আসবেন নেমে জিব্রাঈল আমীন।" এভাবে সম্পূর্ণ গানটিই বুঝিয়ে দিলেন তিনি। ওখানে আমাদের দেখানো হলো ঐ মুদ্রণালয়, যেখান থেকে ছেপে বের হয় জিহাদের খবরাখবর ও সাময়িকী। বিরাটকায় একটি ট্রাকের উপর স্থাপিত ভ্রাম্যমান এই প্রেসটি অত্যন্ত উন্নত এবং সর্ব সাম্প্রতিক মডেলের।

'মাদ্রাসা-ই-আমর বিন হাযম' নামক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলাম। উন্নতমানের পাঠ্যক্রম। ক্লাসরুম, হল এবং ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উৎকর্ষতাপূর্ণ একটি ফার্সী সঙ্গীত ছাত্রদের পরিবেশন করতে শুনলাম। শুরুর কথাগুলোর অনুবাদঃ

হে অদ্বিতীয় জাতি, এক মন হও, হও এক প্রাণ,
শরীর আর প্রাণ যেমন, একই পণ আর প্রতিজ্ঞাময়।

আরেকটি শোনালো আরবীতে। যাতে রয়েছে আল্লাহর প্রতি করুণ আকুতি ও হৃদয় সিক্ত করা মিনতি। আরও রয়েছে খোদার রাহে নিজেকে কুরবান এবং সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার গভীর আকুলতা। সঙ্গীতের প্রারম্ভে রয়েছেঃ

উপস্থিত হে প্রভু, বানাও তোমার দিকে সিঁড়ি,
মোদের মাথার খুলি দিয়ে,
হে শৌর্যের ইসলাম, আমরা উপস্থিত!
সরাই মোরা সীমান্তের প্রহরায় অগ্রণী।

হাসপাতালে পরিদর্শন ও আহতদের শয্যাপাশে

অতঃপর গাইড আমাদের নিয়ে গেলেন আল-ইত্তেহাদুল ইসলামীর কেন্দ্রীয় হাসপাতালে। (আল-ইত্তেহাদ আফগান মুজাহিদদের সাত দলীয় ঐক্যজোটের একটি অঙ্গ দল।) কাবুল মেডিক্যাল কলেজের পাসকরা ডাক্তার ভাই সাদাত আমাদেরকে স্বাগত জানান। এখানে আমরা বহুসংখ্যক রোগী এবং বিভিন্ন যুদ্ধে সোভিয়েত ও কমিউনিস্ট দুশমনদের বোমা, মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের আঘাতে জখম ও বুলেটবিদ্ধ ভাইদেরকে দেখলাম।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধিদল

এরপর আমরা হাসপাতাল পরিচালকের সঙ্গে তাঁর দফতরে মিলিত হলাম। সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পরিচালক সাহেব মুহাজির ক্যাম্প, জিহাদ ও মুজাহিদদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহ পরিদর্শন এবং অসুস্থ রোগী ও যুদ্ধাহতদের শয্যাপাশে গমনের জন্যে আমাদের প্রতি গভীর সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমরা সেসব হতভাগ্যের কাছে গিয়েছি, যাদের সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না আর তাদের অবস্থার খোঁজ নেয়ারও কেউ নেই। তিনি আরও বলেনঃ আলহামদুলিল্লাহ্! আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই আল্লাহর, যিনি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিশ্বের পরাশক্তি রাশিয়ার সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার তাওফীক আমাদের দিয়েছেন। কোন রকম ভারী অস্ত্র বা বস্তুগত কোন রসদ-সরঞ্জাম ছাড়াই আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়ছি। প্রথম প্রথম তো আমাদের কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকই ছিল না, যা দিয়ে আমরা অসুস্থ ও আহতদের শুশ্রূষা করতে পারবো। দীর্ঘ তিনটি বছর এভাবেই কাটলো। এরপর আল্লাহপাকের তাওফীকে মুসলিম বিশ্বের সহায়তায় এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হলো। এখন এখানে চারটি বিভাগ রয়েছে। সার্জিক্যাল বিভাগ, চর্ম বিভাগ, শিশুদের আভ্যন্তরীণ ব্যাধি বিভাগ, সাধারণ চিকিৎসা ও কর্ণ বিভাগ।

হাসপাতালের অভাব ও চাহিদাসমূহ

জনাব পরিচালক প্রতিনিধিদলের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেনঃ অস্ত্রোপচার এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ আমাদের এখন খুব বেশি প্রয়োজন। জানেন? এই দুই বিভাগের বহু বিশেষজ্ঞ এখানে ছিল, কিন্তু তারা চাকুরী ছেড়ে চলে গেছে।

যদ্দরুন কোন কোন সময় আমরা রোগীদের পাকিস্তানের দূরবর্তী হাসপাতালগুলোতে পাঠাতে বাধ্য হই। যেমন, আমাদের প্রয়োজন রোগী বহনের জন্যে এম্বুলেন্সের। এছাড়া আমাদের ঔষধও সংগ্রহ করতে হয়। কারণ, (হিলালে আহমর) রেড ক্রিসেন্টের সরবরাহকৃত ঔষধ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

সবশেষে তিনি পুনরায় আমাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললেন, এ ধরনের খিদমতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে যে আমরা টিকে আছি, এটা আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার তাওফীক দিয়েছেন। এ জিহাদ রুশ বনাম আফগানিস্তান যুদ্ধ নয়, বরং ইসলাম ও কুফরের লড়াই।

২.৩.৮৮ বিষ্যুদবার বিকেল বেলা আফগান জিহাদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং বহু রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী লড়াকু সেনা মাওলানা আরসালান রহমানীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। যাঁর সম্পর্কে কথিত আছে যে, সোভিয়েতরা এই মাওলানার তথ্য-অনুসন্ধানের জন্যে বহু সম্মেলন অনুষ্ঠান করেছে এবং তারা তাঁকে 'মানুষ খেকো' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। আমরা তাঁর সাথে দেখা করলাম। তাঁর রাশভারি গম্ভীর চেহারায় ইবাদতের জ্যোতি জ্বলজ্বল করছিলো। প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর অনুসরণে আমরা একটি সময় জিহাদরত অবস্থায় কাটালাম। " হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যে দ্বীন হতে ফিরে যাবে, অচিরেই তাদের বদলে আল্লাহ অন্য একটি জাতির অভ্যুদয় ঘটাবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন আর তারাও তাঁকে (আল্লাহকে) ভালোবাসবে, মুমিনদের প্রতি তাঁরা কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। এরা লড়াই করবে আল্লাহর পথে, আর নিন্দুকের নিন্দায় এরা ভীত হবে না।"

এ সমস্ত কমিউনিস্ট (যারা আল্লাহ্-বিদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে) এরাই তাদের দ্বীন হতে বেরিয়ে গেছে। এদের মাতা-পিতা ও পূর্বপুরুষরা ছিলেন মুসলমান, আর এরা দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে–ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাগুতের।

শুভসংবাদ

আরসালান রহমানী বলেনঃ আমাদের একজন মুরুব্বী ছিলেন, যিনি মাদ্রাসায় পড়াতেন। তিনি বলেছেন, জিহাদের ব্যাপারে আমি প্রথমে একটু সন্দেহ-সংশয়ে ছিলাম। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, বহু লোকের জমায়েত; আর হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আফগান মুজাহিদদের মাঝে অস্ত্র বিতরণ করছেন। এরপর সব দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। বুঝতে পারলাম যে, মুজাহিদরাই হকের ইপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ জিহাদ "ইসলামী জিহাদ"।

আরসালান আরও বলেনঃ কোন একদিন আমরা দুশমনের কেন্দ্রগুলোতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমাদের সাথে ছিল শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া যুদ্ধলব্ধ ট্যাংক, কিন্তু খালেদ নামের একজন নেতা আমাদের সাথে একমত হতে পারলেন না। তিনি আক্রমণের ব্যাপারে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করলেন। পরদিন সকালে একজন মুজাহিদ জওয়ান আমাকে বললোঃ গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, আপনি একটি হাউজে ওযু করছেন আর আপনার পাশে দাঁড়িয়ে হযরত রসূলে আকবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, "দুশমনের উপর তোমাদের আক্রমণ করা উচিৎ। খালেদের দ্বিমতে তোমরা কান দিও না।"

মনে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নটা মাওলানাকে করেই ফেললাম, আচ্ছা। এমন একটা পরাশক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রথম প্রথম আপনারা কী করে সাহস করলেন? আপনাদের মনে কি কোনরূপ ভীতি বা দুর্বলতা ছিলো না? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি ছিলাম স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন মানুষ। রাতের বেলা চলতেও ভয় করতো। আমার কুরবানীর জন্তুটিও আমি জবেহ করতে পারতাম না। অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতাম। এমনকি একটা মুরগী জবেহ করার মতো মামুলী সাহসও আমার ছিলো না। একবার আমার একটা বকরী অসুস্থ হয়ে মরেই গেলো, কিন্তু প্রাণ থাকতে ওটাকে জবেহ করা আমার পক্ষে হয়ে উঠেনি। আর এখন তো আমি সিংহ আর সর্পকেও ভয় করি না। জিহাদ আমার দুর্বলতা, ভীরুতা ও অপারকতাকে শক্তি-সাহস আর শৌর্য দিয়ে বদলে দিয়েছে।

এ প্রশ্নটা আমি ব্যাপকভাবে গোটা আফগান জনগণের প্রতিরোধ লড়াইর ব্যাপারে করেছি, আমি বললাম। তিনি বললেনঃ আসলে মুজাহিদদের বড় অংশটাই

হলো আলেম-উলামা। তাঁদের তো যুদ্ধের সাথে কোন সম্পর্কই ছিল না। তোপ-কামান, বোমা-ট্যাংকের সাথেও তাঁরা ছিলেন না পরিচিত। আমরা সবাই তো এমন ছিলাম, কিন্তু আজ যখন ওসব অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করি, মনে হয়ে যেন ওগুলো আমাদের হাতেই তৈরি।

এরপর আমি জিজ্ঞেস করলামঃ মুজাহিদদের বিভিন্ন দল ও গ্রুপের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এবং সংরক্ষণে আপনারা কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? তিনি বললেনঃ কখনো না। মতবিরোধ থাকলে তা আছে আঞ্চলিক পর্যায়ে। তা কোন সময় সীমান্ত পেরোয় না। কারণ, শয়তান তো আফগানিস্তান ছেড়ে দিয়েছে। সে তো মুজাহিদদের মাঝে ভাঙ্গন ধরানোর ব্যাপারে একেবারেই আশাহত হয়ে গেছে।

মুজাহিদদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত সম্পর্কে বলতে গিয়ে রহমানী উল্লেখ করেনঃ মুহাম্মদ ইবরাহীম মুজাদ্দেদী ছিলেন আমাদের এক বুযুর্গ। দুশমনরা তাঁকে ধরে নিয়ে বন্দী করে রাখে এবং ক'দিন পরে ছেড়েও দেয়। কিছুক্ষণ পর আমরা ঐ দুশমনটিকে বন্দী করি, যে এই বুযুর্গকে ধরে নিয়েছিল। এ সময় বুযুর্গের একজন শাগরেদ এসে বললোঃ আপনারা একে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি একে শেষ করে দেই। আমাদের হুযুরকে সে বন্দী করে কষ্ট দিয়েছে। আমরা বললামঃ না, না, আমরা তোমাকে এর অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, দুশমনের প্রতিশোধ আমরা নেই আল্লাহর ওয়াস্তে আর আমাদের বিজয়ও তাঁরই উদ্দেশে, কোন পীর-মাশায়েখ বা আত্মীয়ের জন্যে নয়।

এ দিনই সন্ধ্যায় জিহাদ পল্লীর পার্শ্ববর্তী বাজার ও রাস্তাঘাট ঘুরে দেখলাম। বিশাল এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত "ইসলামী শিক্ষার উচ্চতর ইনস্টিটিউট" হয়ে গেলাম। আসা-যাওয়ার পথে দেখলাম হাজার হাজার আফগান মুহাজিরের জীবনযাত্রা। শ্যামল উর্বর কিছু চাষের জমি দেখলাম, নল দিয়ে চলছে সিঞ্চন। মাগরিবের একটু আগে মুহাজির পল্লীর মসজিদে ফিরে এলাম। এর কাছেই আমাদের থাকার জায়গা। মসজিদের দরজার পাশে কতিপয় পঙ্গু-যুদ্ধাহত মুজাহিদ দেখতে পেয়ে সালাম দিলাম। এদের কেউ হয়তো চোখ হারিয়েছে, কেউবা হাত-পা। আল্লাহর পথে জিহাদ করতে যেয়ে তারা যে সৌভাগ্য লাভ করেছে তা নিয়ে ওরা একে অপরের সাথে কথা বলছিলো।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহের সাথে

আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী প্রধান মাওলানা আবদু রাব্বির রাসূল সাইয়াফের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ছিলো মাগরিবের পর। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান তিনি। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ইঞ্জিনিয়ার আহমাদ শাহ বলেনঃ আমরা আশা করি আফগানিস্তান হবে সত্যিকার অর্থেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা বা সমাজতান্ত্রিক প্রভাববলয় মুক্ত কোন ইসলামী দেশই আপনারা খুঁজে পাবেন না। আফগানিস্তান হবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রস্থল। আমাদের আশা, সারা বিশ্ব জুড়ে সংঘটিত ইসলামী জাগরণে আপনারা নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। মিসরীয় যুবকদের দেখবেন শরীয়ত মোতাবেক চলছে। মিসরীয় রমণীরা এখন মেনে চলছে ইসলামী পর্দা। ছয় বছর আগেও তারা যেভাবে চলাফেরা করতো সে রকমটি এখন আর চোখে পড়বে না। এছাড়া আরবীয় যুব সমাজ, যারা বিনোদন ও পর্যটনের উদ্দেশে আমেরিকা বা অন্যান্য উন্নত দেশে যেতে চাইতো, তারা আজ আফগান সফর করে মুজাহিদদের সাথে শরীক হতে ভালোবাসে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে মসজিদে আক্সা এবং সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য সমস্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ"কিয়ামত পর্যন্তই জিহাদ চলবে।" আফগান সমস্যা নিরসনের পরই আমরা মসজিদে আকসা এবং বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর মুক্তির দিকে মনোযোগী হবো। ইসলাম ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলমানদের বিজয়ের জন্যে ইনশাআল্লাহ লড়বো। তিনি আরও বলেনঃ আল্লাহর কাছ আমাদের আশা, তিনি যেন আফগানিস্তানকে বাইরের সব ধরনের রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাবমুক্ত রাখেন। আফগানিস্তান যেন হয় সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন।

আফগান জনতা গর্বিত তাঁদের শহীদানের সংখ্যাধিক্যে

এশার নামাযের পর আমরা গণ্যমান্য কিছু মুজাহিদের সাথে মিলিত হলাম। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় হতে শরীয়া বিভাগের ডিগ্রীধারী মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ শাহ্ আফগানী বললেনঃ কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর আমি দেড় বছরের মতো বন্দী ছিলাম। তখন আমি ওরদক অঞ্চলের মুজাহিদ প্রধান। বর্তমানে আমি দাওয়াত কমিটির

সংস্কৃতি ও চেতনা উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি বলেনঃ এ পর্যন্ত এ জিহাদে শহীদানের সংখ্যা পনের লক্ষে পৌঁছেছে। এদের অনেকেই কারাগারে প্রাণ হারিয়েছে।

এদের মধ্যে নারী-শিশু এবং বৃদ্ধরাও রয়েছে। মুজাহিদদের সেক্টর সংখ্যা এখন চারশঁয়ে উন্নীত হয়েছে। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আফগান মুজাহিদদের ক্লান্তি বা নিরানন্দের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ আফগান জনতা কোনদিন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হবে না। তারা তাদের শহীদদের নিয়ে গর্ব করে থাকে।

এদের মাঝে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে বুক ফুলিয়ে বলে, আমি দুই শহীদের পিতা কেউবা, আমি চার শহীদের জনক-আর যার কোন শহীদ নেই সে আফসোস করে থাকে।

আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী প্রধান সাইয়াফের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত

অধ্যাপক সাইয়াফ আফগানিস্তানের বিশিষ্ট একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব। রাশভারি গাম্ভীর্যপূর্ণ এক মহান ব্যক্তি। আরবদের মতোই তাঁর আরবী বলা। মাওলানা তাঁর বাসায়ই আমাদের দেখা করার সুযোগ দিলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রাসাদই বলা চলে তাঁর বাসাটাকে। মাওলানা সাইয়াফ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর সারগর্ভ বক্তব্য রাখলেন। ফিলিস্তীন সমস্যার ব্যাখ্যা দিলেন। আফগান জিহাদ সম্পর্কে বললেনঃ মুজাহিদরা আল্লাহর সাহায্যে যথাসম্ভব আগে বেড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে সংঘটিত করেছেন এই মহাসাফল্য। সুতরাং রাশিয়া তার পরাজয় স্বীকার করেছে-যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে চেপে ধরেছে আমেরিকার পা। ভারতেরও সহায়তা মাগছে। কিন্তু জিহাদ চলবেই। আমরা আপনাদের সুসংবাদ দিতে চাই, খুব শীঘ্রই সমগ্র ইসলামী দুনিয়া একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এ বিশাল দেশের পতাকা হবে "আল্লাহু আকবার।"এ রাষ্ট্রের জাতীয়তা হবে বৃহত্তম ইসলামী দেশ। মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্র ভ্রমণ করবে, এতে আবার ভিসা লাগবে কেন? দেশে দেশে এই সীমান্ত আল্লাহ্ দিয়ে দেননি। বরং ভৌগোলিক সীমারেখার এ বাধা শয়তান সৃষ্ট। এটাই বিশ্ব-চরাচরে জন্ম নেয়া প্রধান বেদআত।

তিনি আর বলেনঃ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি (তখন জেনেভা-চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা চলছে) মুজাহিদদের জন্যে কঠিনতম সময়। আমরা তো এ চুক্তি

প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করেছি। কারণ, এটা মুজাহিদদের অবস্থান আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আনন্দঘন এ পরিবেশে খুবই শান্তি ও স্থিরতার সাথে আলাপ হলো। মাওলানা ঈমান ও আবেগপূর্ণ হৃদয় নিয়ে কথা বলছিলেন। সারাক্ষণ তিনি যেন কমিউনিস্ট এবং রুশ দুশমনদের উপর রাগে গরগর করছিলেন। আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে দো'আর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শেষ হলো।

বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ হতে গভীর ভালোবাসা পৌঁছে দিয়ে আমি মাওলানা সাইয়াফের বক্তব্যের পর কথা বললাম। এ জিহাদে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার কথাও স্বীকার করলাম। আশা প্রকাশ করে বললাম, আল্লাহ্ যেন আফগানিস্তানকে সত্যিকারের স্বাধীন একটি ইসলামী দেশ এবং ইসলামী দাওয়াতের মহাকেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেন। এ দেশ যেন হয় বিশ্ব দরবারে ইসলাম ও মুসলমানের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে প্রধান প্রশিক্ষণ ঘাঁটি। সাক্ষাৎকার শেষে মাওলানা সাইয়াফ বললেনঃ রণাঙ্গন, ঐতিহাসিক স্থান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যাওয়ার জন্যে আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্মসূচী তৈরির জন্যে আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি।

প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন

৪.৩.৮৮ সকালে নাস্তার পর হিজরত পল্লী হতে আমরা পেশোয়ার রওনা হলাম। পেশোয়ারে আমরা বেশীক্ষণ থাকিনি। কারণ, আমাদেরকে সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। বারটার সময় আমরা কোহাটের সুউচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করলাম।

বেলা পোনে চারটায় আফগানিস্তানের খোস্ত অঞ্চলের পাহাড় ও ময়দান আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম। আসরের সময় পৌঁছলাম "শাদ্দা" ক্যাডেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শিশো ক্যাম্প হিসেবেই এটা বেশি পরিচিত। প্রবেশদ্বারে স্বাগত জানালেন কেন্দ্রের পরিচালক মেজর গোলামুদ্দীন। জানতে পারলাম, এ কেন্দ্রটি অধ্যাপক সাইয়াফের তত্ত্বাবধানে। কেন্দ্রটিতে কয়েকটি বিভাগ ও একটি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। কলেজের পাঠক্রম দু'বছর। এ সময় কলেজটিতে দুই শত প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শাদ্দা অঞ্চলটি বিশিষ্ট নেতা ওয়ালী খানের সাথে সম্পর্কিত। এটি পাখতুনিস্তানের একটি এলাকা। ভাই কমান্ডার আবদুর রহমান আমাদের বললেন,

এ স্থানটিতে আফগান মুজাহিদ এবং এতদঞ্চলের বাসিন্দা শিয়াদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ইরান সরকারের ষড়যন্ত্রে তারা রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়েছিলো। কারণ, মুজাহিদদের প্রায় অর্ধেক রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র এ রাস্তা দিয়েই আফগানিস্তানে যায়। শেষ পর্যন্ত এ সংঘর্ষই গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের সাহায্য করলেন। পাকিস্তান থেকে মদদ এলো এবং শিয়া ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে তারা পরাজিত হলো। বন্দী হলো বহু শিয়া।

এখানেই বার্মার ভাই আবদুল কুদ্দুসের সাথে দেখা (তিনি আমাদের পূর্ব পরিচিত), যিনি প্রশিক্ষণ শেষে এখন মুজাহিদদের সাথে কাজ করছেন। দশটিরও বেশি সম্মুখসমরে তিনি অংশ নিয়েছেন। বহুসংখ্যক বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ভারতীয় ও বার্মিজ ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। মুলতানের যুবায়ের আহমদ খালিদ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জিহাদের শুরু হতেই তিনি দুশমনের সাথে লড়াই করে চলেছেন।

মেজর গোলামুদ্দীন মেহমানখানায় আমাদের থাকার সুব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন পাহাড়ের পাদদেশে। হাজারখানেক আরব সেখানে প্রশিক্ষণরত ছিলো। তারা রকেট ও গোলা নিক্ষেপ করছিলো। আমাদের সামনে সর্বপ্রথম যে মুজাহিদ ভাই রকেট নিক্ষেপ করলেন তাঁর নাম আবুল কা'কা।

মুজাহিদদের সামনে আমার বক্তৃতা

মাগরিবের সময় হলে আমাদের শিবিরের পার্শ্ববর্তী বিরাট মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো। মসজিদটি ছিলো আরব মুজাহিদে ভরা। মনে হয় যেন এটি আরব অঞ্চলের কোন মসজিদ। এদের অনেকের সাথেই অস্ত্র। (কালাসনিকোভ) লাইনের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো রেখেছেন তারা। প্রতিনিধিদলটি মসজিদে প্রবেশ করতেই ছোট্ট মাইক্রোফোন হাতে এক যুবক এগিয়ে এলো আমার দিকে। পরে জানতে পারলাম, সে আরব্য নেতা আবু আব্দুল্লাহ উসামাহ্ বিন লাদেন। আমার কাঁধে হাত রেখে সে বলতে লাগলোঃ আসুন, মাওলানা। হাতে ইশারা করলো মিহরাবের দিকে। ওদের সাথে নিয়ে মাগরিব পড়লাম। নামাযের পর ঐ যুবনেতা প্রতিনিধিদলের আগমনের ঘোষণা দিয়ে দলের তরফ থেকে আমাকে কিছু বলার প্রস্তাব করলো। আমি কথা বললাম, এতে বাংলাদেশী মুসলিম জনগণের পক্ষ হতে

সালাম ও শুভেচ্ছা পৌঁছালাম। জিহাদের গুরুত্ব ও প্রেরণার উপর কিছু কথা বলে দায়িত্বশীল শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে কথা শেষ করলাম। কমান্ডার আবু আব্দুল্লাহ উসামাহ্ আমার বক্তব্যের উপর একটি পর্যালোচনা পেশ করলেন।

৫.৩.৮৮ সকাল নয়টায় শাদ্দা সেন্টার ত্যাগ করলাম। আধ ঘন্টায় পৌঁছলাম গিয়ে শাদ্দা শহরে। এখানে আমরা গাড়ী বদল করি। কেন্দ্র হতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন মুজাহিদ নেতা খালিদ মুলতানী, ভাই আবদুল কুদ্দুস বর্মী। পাকিস্তানের শেষ ঘাঁটি প্রাচানার হয়ে আমরা অতিক্রম করলাম। এখান থেকে বরফাবৃত হিন্দুকুশ পর্বতমালা দেখা যাচ্ছিল। এ যেন আরব্য কবি আবু তৈয়্যবের কবিতার বাস্তব রূপঃ

লেবাননের দুর্গম ঘাঁটি
কেমনে দেয়া পাড়ি?
এতো শীতগুল, গ্রীষ্ম এখানে শীত–
বরফ আমার পথ করেছে অস্পষ্ট-অজানা
শ্বেত-শুভ্র বরফ,আমার তরে কালো, আঁধার।

পৌনে বারোটায় পৌঁছলাম ত্রিমঙ্গল। পাক-আফগান সীমান্তের শেষ বাজার। পুরানো রাস্তা রুশ বিমানের বোমা ও মেশিনগানের আঘাতে বিধ্বস্ত। আশেপাশের বেশ কিছু ভবনও আগুনে পোড়া।

দারীন শিবির

সোয়া একটায় জাজী যাওয়ার পথে দারীন শিবির সামনে পড়লো। এখানে গিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে ওযু করলাম। পানিও বরফের চেয়ে কম ঠাণ্ডা নয়। যোহর পড়লাম। এখানে দেখতে পেলাম মুজাহিদরা পাহাড়ে রসদ ও অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। এসব ভাণ্ডারে অতি সহজে পরিবহন ট্রাক ঢুকে যেতে পারে।

আবু রিদওয়ান আল-জাযায়েরী নামক এক আরব মুজাহিদ ও তার ছোট ছেলের দেখা পেয়ে এখানে আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হলাম। ছেলেটির বয়স সাতের বেশি হবে না। মুজাহিদটি আমাদের বললেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিহাদে আসার দাওয়াত দিলে স্ত্রী অস্বীকৃতি জানায়, অতঃপর তিনি তাকে পরিত্যাগ করে দু'ছেলে সাথে নিয়ে আফগানিস্তান পৌঁছেছেন। ছোট ছেলেটি দেখলাম ছোটাছুটি করে আর মুজাহিদদের খেদমত করে।

আবু উয়াইনা নামক জেদ্দার এক যুবক আমাদের খেদমতে ছিল। স্বদেশে তার পেশা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলাম। সে বললোঃ আমি এক কোম্পানীতে কাজ করতাম। আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি পেলাম মায়ের কাছে। আমি বললামঃ তুমি কি কোম্পানীর ছুটিতে রয়েছ? বললোঃ না, আমি কাজ ছেড়ে দিয়েছি। বললামঃ এখন তোমার কি ইচ্ছা? বললোঃ দু'টোর একটি। হয়তো বিজয় নয় শাহাদাত । বললামঃ আফগান যদি মুক্ত হয়ে যায়, আর তুমি বেঁচে থাক, তবে কি করবে? তখন ফিলিস্তীন স্বাধীন করতে লড়াই করবো। তাঁর ঈমানী চেতনায় আমরা মুগ্ধ হলাম। মুজাহিদদের মাঝে তাঁর মতো না জানি কতো যুবক রয়েছে।

আবু আবদুল্লাহ উসামাহ

জানতে পারলাম, দারীল কেন্দ্রটি পূর্বোক্ত আবু আবদুল্লাহ্ উসামার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সউদী আরবের এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। শায়খ বিন লাদেনের বংশধর। বিন লাদেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সবার কাছে পরিচিত। আবু আবদুল্লাহ্ উসামাহ পেশোয়ারে এসে একটি বাড়ী ভাড়া করেন এবং তাঁর স্ত্রীকে এখানে রেখে যান। তাঁর স্ত্রীও একটি ভালো পরিবারের মেয়ে। তিনি নিজের ও স্বামীর কাজ করছেন। স্বামী তো লাগাতার বিশ থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধে কাটান।

বাদ যোহর আমরা নতুন মুজাহিদ কেন্দ্র 'জাজি'র দিকে যাত্রা করি। বরফের পোশাকে আবৃত হিন্দুকুশ পর্বতমালার উপর আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ দিয়ে আমরা গাড়ীতে করে চলছিলাম। এর চেয়ে বেশি আঁকাবাঁকা পথ আমি জীবনে দেখিনি। থাইল্যান্ডে পৃথিবীর সেরা দুর্গম পথ। সেখানে গাড়ীগুলো মেঘমালারও উপরে উঠে পড়তো। আর যখন হিন্দুকুশ পর্বতে মুজাহিদদের তৈরি অসমতল পথে চলার সুযোগ এলো, দেখতে পেলাম, এটা তো আরো বেশি দুর্গম। গাড়ী আমাদেরকে নিয়ে ওঠানামা করতে যেন কোন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউয়ে নৃত্য করছে। কখনো উচ্চতা হাজার ফুটে উঠতো।

বৃষ্টি ও তুষারপাত এ পরিবেশকে আরও জটিল করে দিচ্ছিল। আমরা বললামঃ ইয়া আল্লাহ্, কী আশ্চর্য! কেমন করে সব সময় মুজাহিদরা এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করে? তারা বললেনঃ মুজাহিদদের গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হতে আমরা কোনদিন শুনিনি। নিঃসন্দেহে এটি একটি কারামত।

আমরা এখন জাজিতে

৫.৩.৮৮ শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় পৌঁছলাম নতুন মুজাহিদ কেন্দ্র জাজি। বাদ আসর মুজাহিদরা তাঁদের আধুনিক অস্ত্রে ফায়ার করার সুযোগ দিলেন আমাদেরকে। আমরা কালাসনিকোভে তিন চারটি করে ফায়ার করলাম আমাদের জন্যে নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে। এরপর মাগরিব পড়লাম। অল্প একটু বিশ্রাম করলাম। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের কতিপয় মুজাহিদের সাথে পরিচিত হলাম।

প্রহরী মুজাহিদীনের দস্তরখানে আফগানী রুটি আর সবজি-তরকারি দিয়ে রাতের খানা খেলাম। সব ব্যাপারেই নিতান্ত সাদাসিধে, সহজ-সরল ভাব লক্ষ্য করলাম। এখানে এশা পড়লাম। আমাদের কেউ কেউ অযু করলেন আর কেউবা তায়াম্মুম। পানি গরম করার ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এ অবস্থা। হিন্দুকুশ পাহাড়চূড়ায় যে ঠাণ্ডা অনুভব করেছি তা জীবনে আর কখনো করিনি। এতোসব সত্ত্বেও রাতটি ভালোই কাটালাম। স্থানটি ছিলো মুজাহিদদের প্রহরা চৌকির কাছে। এ রাতটি প্রহরায় অংশ নিয়ে কাটানোর জন্যে তাঁরা আমাদের বললেন, কিন্তু কষ্টকর দীর্ঘ সফরে আমাদের সাথীরা খুবই পরিশ্রান্ত থাকায় আমরা সাহস করতে পারিনি। অবশ্য আমাদের সাথী মুজাহিদরা শত্রুদের প্রতিরোধ প্রহরায় শরীক হন।

বাদ ফজর তাঁদের অনুরোধে কিছু কথা বললাম। এক যুবক মুজাহিদ আমাদের সাথে কয়েকটি ফিক্হী মাসায়েল নিয়ে প্রশ্নোত্তরে নামলো। সম্ভবতঃ সে সউদী আরবের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবে। ফিকাহর ইমামদের তাকলীদ সে ভালো চোখে দেখে না। অতঃপর আমরা নাস্তা করলাম এবং খারাপ আবহাওয়ার দরুন তাড়াহুড়া করে ফিরতে চাইলাম।

জাজির লড়াই

নিকট অতীতে জাজিতে সংঘটিত হয় এক রক্তাক্ত লড়াই, বললেন ভাই আবদুর রহমান বাংলাদেশী। রাশিয়া তিন হাজারের মতো কমান্ডো সৈন্য এখানে নামায়। স্থলপথেও শত্রুদের বিরাট সমাবেশ। সব মিলিয়ে পনের হাজারের মতো হবে। আর মুজাহিদরা তিন হাজারের মতো। দু'দলের সংঘাত হলো। পঞ্চাশ জনের মতো মুজাহিদ শহীদ হলেন। দুশমন খতম হলো সাতশ'য়ের কাছাকাছি। এ রণাঙ্গনে আরবদের অংশগ্রহণ ছিলো বড় ধরনের।

৬.৩.৮৮ রোববার আটটার পর আমরা গাড়ীতে বসলাম। জাজি থেকে ফিরছি, আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় সবাই ভীত। আল্লাহর হেফাযতে সকাল সাড়ে ন'টায়

ত্রিমঙ্গল পৌঁছলাম। তিন ঘন্টারও বেশি লাগলো, শাদ্দা শহরে প্রতিদিধিদলের রাহবর মুজাহিদ নেতা আমাদেরকে হোটেলে খাইয়ে এনেছিলেন। সুতরাং আমরা চা খেয়েই রওয়ানা হই এবং রাতে পেশোয়ার পৌঁছি।

কিছুক্ষণ আমরা হারকাতুল জিহাদ অফিসে বিশ্রাম নিলাম। আমাদের প্রতিনিধিদলের মালপত্রও অফিসেই ছিলো। জামা-কাপড় বদলে নিলাম। পেশোয়ার শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত মাদরাসা -ই-দারুল কুররায় রাতের খানা ও রাত্রি যাপনের দাওয়াত গ্রহণ করলাম। সত্যিই সেটি আমাদের জন্যে খুবই উপযোগী অবস্থান ও মনের মতো ঠিকানা হিসেবে প্রমাণিত হলো। ওখানে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন দারুল কুররার পরিচালক কারী শায়খ ফাইয়াজুর রহমান ও তাঁর বন্ধু কারী দাইদ (তিনি সদ্য লন্ডন হতে ফিরেছিলেন)। পরিচালক মহোদয় একজন প্রাণবন্ত যুবক, চল্লিশের দশকে তাঁর সজীব জীবন। আমরা মাদরাসার শ্রেণীকক্ষ ও মিলনায়তন ঘুরে দেখলাম। পরিচালক সাহেব আমাদের সবকিছু দেখালেন, সব বিষয়েই কথা বললেন। সুন্দর প্যাটার্নের বিশাল ইমারতবিশিষ্ট মাদরাসা। প্রতিটা জিনিসই সুব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠাতার সুরুচির পরিচায়ক। হেফয, তাজভীদ ও ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে পরিচালক আমাদের অবহিত করেন। ব্যতিক্রমধর্মী ও বৈশিষ্ট্যময় এ ব্যবস্থা আমাদের পছন্দ হলো। কারী ফাইয়াজ সত্যিই সদালাপী, সুন্দর মানুষ। তাঁর মাঝে এক বিরল কার্যক্ষমতার ছোঁয়া আমরা পেয়েছি।

৭.৩.৮৮ সকাল সাড়ে আটটায় প্রতিনিধিদলটি পেশোয়ারস্থ হারকাত অফিস ত্যাগ করলো। ফেরার পথে আমাদের সঙ্গী হলেন একজন পঙ্গু ব্যক্তি, খুব শুদ্ধ তাঁর তিলাওয়াত, নাম কারী মুহাম্মদ সাবের। শহীদ ইমাম সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদদ্বয়ের শাহাদত ভুমি বালাকোটের পার্শ্ববর্তী গ্রামে তাঁর বাড়ী। রুশ-আফগান লড়াইয়ের প্রসিদ্ধ সংঘর্ষ 'উরগুন' রণাঙ্গনে তাঁর শরীরে বোমা পড়লে তিনি পঙ্গুত্বের শিকার হন। উপজাতিদের আবাসস্থল কোহাট এবং টিল, দোয়াবা, কাওয়াকা, কুর্ম হয়ে সরকারের সাথে অসহযোগ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিই এদের কাজ।

হাতিয়ার কারখানা

পেশোয়ার হতে ৩৮ কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা আদমখিল গিরিপথে পৌছলাম। এখানে অস্ত্র কারখানা রয়েছে। পথের দু' পাশের দোকানগুলোতে

দেখতে পেলাম প্রকাশ্যভাবে অস্ত্র কেনাবেচা চলছে। এতে সরকারী অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। কোন কোন সময় মুজাহিদরাও এখান থেকে অস্ত্র খরিদ করে থাকেন।

আমাদের বলা হলো, এ অঞ্চলের কাছে হীরক ও দামী পাথরের খনি রয়েছে। এগুলো মুজাহিদদের দখলে। এলাকাটা ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহের শাসনাধীন। হীরে মোতি ও পান্নার কেন্দ্র এটি। বারবার এ অঞ্চলের উপর হয়েছে রুশ আক্রমণ। কিন্তু একবারও তারা সাফল্যের মুখ দেখেনি । প্রতিবারই ব্যর্থতা। (উদ্ধৃতি শেষ)

স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্য, কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়ার উপাধ্যক্ষ, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান খান সাহেব বলেনঃ আফগানিস্তানের জিহাদ সমগ্র মুসলিম জাতির জন্যে এক মহা-সৌভাগ্য। পৃথিবীর দুই পরাশক্তির হিংস্র পাঞ্জা ও সকল প্রকার তাগুতী অক্টোপাশের কবল থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত করে সঠিক ইসলামী জিন্দেগীর পথে নিয়ে যেতে হলে আফগান মুজাহিদদের সংগ্রামী পথকেই বেছে নিতে হবে। কারণ, শাহাদাতের তাজা খুন ছাড়া উম্মতের সম্মান ও মর্যাদার ভিত্ পোক্ত হয় না। জিহাদই ইসলামের মূল রক্ষাকবচ। ঢাকা হতে করাচী-ইসলামাবাদ হয়ে আমরা যখন পেশোয়ারের মুহাজির পল্লীতে যাই, তখন কারে বসে দেখেছি অসংখ্য শহীদ আফগানীর শেষ বিছানা। কবরে শুয়ে তারা যেন অপেক্ষা করছে, কবে আসবে সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের দিনটি, যেদিন আল্লাহর বাণী হবে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত।

মাওলানা আতাউর রহমান খান আরও বলেনঃ সাধারণতঃ আমরা শরণার্থী শিবির বলতে মনে করি মানবেতর জীবন যাপনরত কিছু বনী আদমের ঘিঞ্জি বস্তি। কিন্তু পাক-শিবিরগুলো দেখে ভাবাও যায় না যে, এগুলো রিফিউজী ক্যাম্প; বরং শিবির গুলোকে পাক সরকারের পক্ষ হতে আফগানী মুসলমানদের জন্যে তৈরি, আরব বিশ্বের সৌজন্যে ধন্য বিশাল একটি মেহমান নগরী বলেই মনে হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সচিবালয়টিও এ ক্যাম্পের ভেতর। মূল আফগান ভূখণ্ডে যখন আমরা একটি ক্যান্টনমেন্ট দেখতে গেলাম, তখন তুষারপাত হচ্ছিলো। বরফের লেপে ঢাকা পাহাড়ী পথের দুর্গম চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ী। মুজাহিদ ড্রাইভার ছাড়া আমরা সবাই ভয়ে আতংকগ্রস্ত। কারণ, সাধারণ

একটু স্লিপ করলেই হাজার হাজার ফুট নিচে পাহাড়ী খাদে পড়ে যাবে গাড়ী। আল্লাহ আল্লাহ করে পৌঁছলাম 'জাজি' ক্যান্টনমেন্টে। গাড়ী থামতেই দৌড়ে এলো ৫/৭ টা হিংস্র পাহাড়ী কুকুর। আমাদের গাড়ীতে বসা মুজাহিদ অফিসার ইশারা করতেই ওরা চলে গিয়ে বরফে গড়াগড়ি দিয়ে খেলতে লাগলো। এসব মুজাহিদদের কুকুর। কমিউনিস্টদের আতংক। 'জাজি' হতে ফিরে আরও ক'জায়গায় গিয়েছি। রাতের বেলা কোন শহরে আমাদের গাড়ী ঢুকলে খুব কড়াকড়িভাবে চেক করা হতো। গভীর রাতে দেখেছি, বুড়ো মুসল্লীরা চাদর গায়ে দিয়ে শহরের অলিতে-গলিতে হাঁটছেন। চাদরের নিচ দিয়ে উঁকি মেরে আছে মেশিনগানের ব্যারেল। এরাই মুজাহিদ।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্ ও শায়খ সাইয়াফসহ অন্যান্য অনেক নেতার সাথে দেখা হয়েছে। জেনেভা চুক্তি বা কোন পরাশক্তির মুরুব্বীয়ানা মানতে তারা নারাজ। তাদের এক কথা–"জিহাদ-শাহাদাত নয় বিজয়।" মোটকথা, আফগানদের জিহাদী মনোভাব ও স্বাধীনতার মন-মানসিকতা দেখে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাফল্য এদের প্রাপ্য। বিজয় এদের সুনিশ্চিত।

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ আমাদের কাছে যে কর্মসূচী তুলে ধরেছেন তা সত্যিই সুখকর।

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ বলেছেনঃ আফগানিস্তান শত্রুমুক্ত হলে এদেশে "খিলাফত আলা মিনহাজিন্নবুয়ত" প্রতিষ্ঠা করবো। তারপর আফগানিস্তান হতে পরিচালিত হবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন। সমস্ত মুসলিম দেশসমূহের স্বার্থে আফগান হবে উৎসর্গীকৃত। পৃথিবীর সকল মুসলমানের হয়ে লড়াই করবে আফগান জনতা।

ঢাকার একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে জনাব মাওলানা আতাউর রহমান খান বলেনঃ কোন পরাশক্তির সুনজর বা পার্থিব কোন উপাদান নয়, বরং প্রবল ঈমানী শক্তিই মুজাহিদদের শক্তির উৎস, মূল হাতিয়ার। সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা খান বলেনঃ ইসলামী জীবনপ্রণালীর বাস্তব অনুসরণ ও পরিপূর্ণ এখলাস ও লিল্লাহিয়াতই কোন ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি হওয়া চাই। আর এ ধরনের কোয়ালিটিসম্পন্ন কর্মীবাহিনীর জন্যেই সফলতা ও বিজয়ের দুয়ার উন্মুক্ত।

আফগান স্টাইল বিপ্লব

সোভিয়েত লাল ফৌজের সীমাহীন হিংস্র পাশবিকতা ও বর্বরতা, নিরীহ-নিরপরাধ একটি সাদা-সিধে গরীব জাতির সুখের নীড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া, মসজিদ মাদ্রাসা, মা-বোন-স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা ও সম্ভ্রমহানি এবং বিশ লাখ মানুষের রক্তে রাশিয়ার রং জ্বলে যাওয়া লাল পতাকা নতুনভাবে রঙিন করার মতো ঐতিহাসিক আগ্রাসনকে স্বাগত জানিয়ে শতকরা ৯৭ জন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা বেশ ক'বছর আগেই বলেছিলো যে, "এ দেশেও আফগান স্টাইলে বিপ্লব হবে।" এ দেশী কমিউনিস্টরা অবশ্য সেদিন জানতো না যে, রাশিয়ার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার মতো মানুষও আল্লাহর দুনিয়াতে আছে।

মুজাহিদ কায়দায় এর প্রতিরোধ

বাংলাদেশের সোভিয়েতপন্থী মস্কোজীবীদের এ নাপাক উক্তিটির জবাবে এ দেশের তাওহীদী জনতার পক্ষ হতে দেশের কিছু সচেতন উলামা-লেখক-বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক জবাব দিয়েছিলেন। "বাংলাদেশে যদি সত্যিই আফগান স্টাইলে বিপ্লব হয়, তবে সেটা মুজাহিদ কায়দায় প্রতিহত করা হবে ইনশাআল্লাহ।"

একটু ভেবে দেখুন

এখন আফগান স্টাইলে বিপ্লবী ভাইদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখেন যে, "মুজাহিদ কায়দাটা" আসলে কি? কেন সোভিয়েত সৈন্যরা মার খেয়ে ফিরে গেলো? কিসের বলে নিরীহ মোল্লা-মুসল্লী সাধারণ জনগণ একটা পরাশক্তির দম্ভ চূর্ণ করলো? কী দেখেই বা অমুসলিম নাস্তিকরা চিৎকার করে বলে ওঠে, "আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি।" গড্ডলিকা প্রবাহে না ভেসে সত্য ও সুন্দরের পথে এসে সত্যিকার সফল জীবন লাভ করার এখনই প্রকৃত সময়। কেননা, শত হাত-পা ছুঁড়েও ইসলামের বিজয় ঠেকাতে পারবেন না। তাছাড়া পরকালীন জীবনে তাদের ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

আমরা আর কোনদিন ফিরে আসবো না

প্রায় এক যুগ আফগানিস্তানের বুকে কিয়ামতের তাণ্ডব চালিয়েও যখন আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাসী তাওহীদী জনতাকে বাগে আনা সম্ভব হলো না, বরং ঘুমে অচেতন একদল শার্দূল সন্তানকে জাগিয়ে তোলার মতো ঐতিহাসিক ভুল হয়ে গেলো, তখন

মুজাহিদদের হাতে চরম মার খাওয়া সোভিয়েত সৈন্যরা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কারণ, প্রতিদিন পাগড়ী,দাড়ি টুপিওয়ালাদের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রাণ হারানো নাস্তিক সৈন্যদের বহনকারী হেলিকপ্টার ও বিমানের বহর দেখে দেখে তখন গোটা সোভিয়েত-বাসীর মন ভেঙ্গে গিয়েছিলো। নাস্তিকদের তো বিশ্বাসের কোন তলা নেই, আল্লাহর উপর ভরসা নেই, আত্মার নিঃসীম শূন্যতা ও সর্বগ্রাসী হতাশায় তারা চব্বিশ ঘন্টাই থাকে নিমজ্জিত। অতএব, তারা মুহাম্মদী বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আফগান জনতার উপর আক্রমণ করে যে মারাত্মক ভূল করেছে, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলো। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভ ভূল স্বীকার করার পর পরই শুরু হয়ে গেলো সৈন্য প্রত্যাহার। একে একে সকল নাস্তিক সেনা মুখ চোঙ্গা বানিয়ে ফিরে গেলো তাদের দেশে। সর্বশেষ সোভিয়েত সৈন্যটি যখন আফগানিস্তানের ভূভাগ ছেড়ে সোভিয়েত মাটিতে পা রাখছিলো, তখন সামরিক নিয়ম অনুসারে সে সীমান্তের মাঝরেখা বরাবর গিয়ে শেষবারের মতো একবার পাগলা মুজাহিদদের দুর্জয় যমীনের দিকে চরম বেদনাতুর দৃষ্টি মেলে চাইলো। বললো, "আমরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী সৈন্যবাহিন–বিশ্বের সেরা পরাশক্তি–আমরা ফিরে গেলাম। আর কখনো আমরা এ দেশের মাটিতে ফিরে আসবো না।"

একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর জিহাদী উত্থানের সামনে পরাজিত "সুপার পাওয়ার"-এর প্রতিনিধি যখন প্রতীকি পরাজয় ও পরাভব মেনে নিয়ে আমু দরিয়ার উপর সেতুটি পার হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তার জন্যে আসমান-যমীনে কেউ অশ্রুপাত করেনি। কেঁদে ওঠেনি তার জন্যে আফগানিস্তানের পর্বতশ্রেণী। কারণ, মহান, আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বিধান রয়েছে যে, ইন্নাল বাতেলা কানা যাহুকা–অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। তার অবমাননাকর বিদায় ছিলো একান্ত স্বাভাবিক।

লজ্জার সীমা নেই

সুপ্রীম পাওয়ারের ইজ্জত মেরে ফিরে গেলেন তথাকথিত সোভিয়েত জাতীয় বীরের দল। পেছনে ফেলে এলেন অগণিত সহকর্মীর লাশ। গরীব আফগানদের গোয়াল ঘরে, স্কুলে, মক্তবে ও শস্য গুদামে এখনো গলায় রশি লাগানো অবস্থায় রয়ে গেছে অনেক অনেক যুদ্ধবন্দী। পর্বতময় আফগানিস্তানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে,

পাহাড়ের পাদদেশে, আদিম গুহায়, উপত্যকায়, গিরি-কন্দরে মুজাহিদদের অবস্থান। এসব ক্যাম্পেই বেশির ভাগ বন্দীর আবাস। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদ ও প্রচার মাধ্যম যে সংবাদ প্রকাশ করে, এর চেয়ে আরও বহুগুণ বেশি অদ্ভুত এই মুজাহিদ দলের জীবনযাত্রা। ইতিমধ্যে শত শত যুদ্ধবন্দী সোভিয়েত সৈন্য মুজাহিদদের আখলাক, চরিত্র ও সদাচরণে মুগ্ধ হয়ে ঈমান এনে ফেলেছে। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে এসব নাস্তিক এখন পুরোপুরি মোল্লা হয়ে গেছে। কার্লমার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন-এর অনুসারীরা এখন নিয়মিত নামায, রোযা করেন। সুপার পাওয়ার নামক মাকড়সার জালটির হাকীকত এখন তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে গেছে। ওরা এখন ভালো করেই বুঝেছে ঈমানের কতো শক্তি। বেশ কিছু সোভিয়েত মহিলা-বন্দী নিজেদের খুশীতেই বিয়ে করেছে ক্যাম্পের নও-মুসলিম সহকর্মীকে। আর কেউ হয়তো মুজাহিদ স্বামীর ঘর করছে একান্ত আনন্দচিত্তে। দেশে ফিরে যাওয়া বীর পুঙ্গবেরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলেন বহুদিন।

ঈমানের ছাইচাপা আগুনে নতুন স্ফুলিংগ

আফগান জিহাদের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়া, তথাকথিত পরাশক্তির শোচনীয় পরাজয় ও অসময়ে সৈন্য প্রত্যাহার এবং আল্লাহর অসীম কুদরত ও গায়েবী সাহায্যের অবস্থা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে সোভিয়েত সৈন্যদের মনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তার উন্মেষ ঘটে। একদল শুধু হতাশার আঁধারেই হাতড়াতে থাকে। একদল লজ্জায় মরে। একদল করে নতুন চিন্তার শিকড় সন্ধান। আরেক দল হয়তো মুজাহিদদের গোপন শক্তির উৎস তালাশে প্রবৃত্ত হয়। ভেবে দেখতে শুরু করে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে তো মধ্য-এশিয়ায় আল্লাহ-রাসূল ও কুরআন-হাদীসের প্রবেশাধিকার ছিলো। কিন্তু নাস্তিক কমিউনিস্টরা তো তা নিষিদ্ধ করে রেখেছে। যে ইসলামের পতাকাবাহী জিহাদী কাফেলা আমাদের পিটিয়ে সোজা করে বাড়ীতে ফেরত পাঠালো তাদের মতো ঈমান-আকীদা, সবর-শোক্‌র ও তাওয়াক্‌কুলের সম্পদ তো এ দেশেও ছিলো। আমাদের যে সম্পদ সমাজতন্ত্র নামক রাক্ষস গিলে খেয়েছে, তা কি আমরা পুনরায় ফিরে পেতে পারি না। সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আমরাও কি হতে পারি না সে সাহায্যের অংশীদার। আফগান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নাস্তিক কমিউনিস্টরা, কট্টর সমাজতন্ত্রীরা

দুঃখ আর বেদনাই পেলো। আর সোভিয়েত মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর অধিবাসী, মুসলিম বংশোদ্ভুত অফিসিয়াল কমিউনিস্টদের দিব্যদৃষ্টি খুলতে শুরু করলো। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাল ঘোড়ার দাবড়ানিতে থেঁতলে যাওয়া ঈমানের শেষ চিহ্নটিতে পুনরায় রক্ত সঞ্চালন শুরু হলো। নাস্তিকতার আবর্জনায় ঢাকা পড়া আর নাফরমানির ছাইচাপা পড়া নিভু নিভু ঈমানের আগুন আবার চিনবিনিয়ে জ্বলে উঠতে শুরু করলো। এককথায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসলগ্ন আর সমাজতন্ত্রের মৃত্যুসন্ধ্যা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো। ইসলামী চেতনার অগ্নি-মশালে সুস্পষ্ট হতে লাগলো নতুন জাগরণের লালিমা। কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক জানোয়ারদের পালের গোদাগুলোকে লাঠিপেটা করে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে আফগান ছাত্র-যুবক-জনতার সাহস বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মক্তবের হুযুর আর মাদ্রাসার মুদাররেস সাহেবদের কলিজার সাইজ এতো বড় হয়ে গেছে যে, একেকজন আলেম গোটা একটি প্রদেশের তামাম কমিউনিস্ট সেনাকে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। অথচ জিহাদ শুরু হওয়ার আগে এ মাওলানা কতো সাদা-সিধে আর নিরীহ মানুষ ছিলেন। জিহাদের শিক্ষা তাঁদের প্রকৃত মুমিনে পরিণত করেছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা শয়তানচক্র, খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তিগুলো এখন এই মওলবীদের উত্থানকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করছে। আফগানিস্তানের কৃষকেরা এখন কাঁধে ক্লাসনিকোভ আর কোমরে রিভলবার নিয়ে হাল চষতে অভ্যস্ত। মহিলারা সাব-মেশিনগানগুলোকে নিজের বাচ্চার মতো যত্ন করছেন। তরুণীদের নাজুক হাতের কোমল আংগুলগুলোও ইদানীং ট্রিগার টেপার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাচ্ছে। ছোট্ট শিশুদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে অত্যাধুনিক গ্রেনেডগুলো। সকাল-সন্ধ্যা যিকির-আযকার করে কাটাতেন যেসব পীরের মুরীদানরা, তাদের গলায়ও এখন বুলেটের তসবীহ্। কী অদ্ভুত এই জীবন্ত জাতি! জিহাদের দীক্ষায় উজ্জীবিত আফগান।

শয়তানের শম্বুক গতি

ইসলামী চেতনা আর জিহাদী জযবায় লালিত এই আল্লাহওয়ালা জাতিটিকে নাস্তিকতার জালে আবদ্ধ করার চিন্তা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন তার মরার অষুধ গলায় বেঁধেছিলো, ঠিক তেমনি ঝিমিয়ে পড়া জাতিটিকে ক্ষেপিয়ে তুলে পৃথিবীর সকল শয়তানই নিজ নিজ লেজে আগুন লাগালো। এ মহাবাস্তবটি বুঝে

আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কূটনৈতিক চক্রান্ত। সম্মুখসমরে কিছুতেই যখন পারা গেলো না,তখন সকল শয়তানের ঠাকুর বুশ ও গর্বাচেভ কূটনৈতিক লাইনে প্রচেষ্টা চালানোর জন্যে নিয়োগ করলো সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে নামক একজন কাজের লোক(?) কে। তিনি ইসলামাবাদ এলেন, মুজাহিদ নেতাদের সাথে বৈঠকে বসলেন। যুদ্ধবিরতির আলাপ ফাঁদলেন। জহির শাহ্‌কে দেশে এনে আবার রাজতন্ত্র কায়েমের ফর্মুলা দিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে মুজাহিদদের ক্ষমতারোহণ করার সহজ তরীকা বাতলে দিলেন। কিন্তু একশ্রেণীর বস্তুবাদী নেতা ও পাশ্চাত্য রাজনীতিতে প্রভাবিত লোক ছাড়া মূল মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবে মোটেও কান দিলেন না। দখলদার হায়েনাদের মুখপাত্র যতো সুন্দর চেহারা নিয়ে কোকিল কণ্ঠেই মুজাহিদদের শুভ কামনা করুক–বাবা, মা,ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজনহারা মুজাহিদরা তার কথায় কান দিতে পারে না। শাহাদাতের আশায়-নেশায় জান্নাতের সীমাহীন আগ্রহে মাতোয়ারা সেনাদল পারে না শয়তানের ঝুলানো মূলায় নাক লাগাতে।

প্রতিটি ফেরাউনের জন্যেই রয়েছেন মূসা

কূটনীতিতেও নাস্তিক্যবাদী শক্তি আফগান মুজাহিদদের সাথে খেলা জমাতে পারলো না। ওরা সশস্ত্র লড়াইয়ের ময়দানে হেরে গিয়ে ভেবেছিলো, সরলমনা আফগানদের বুদ্ধির মারপ্যাঁচে পরাজিত করবে, কিন্তু সর্বদলীয় মুজাহিদ ঐক্য এবং সমবেত বিশ্ব মুসলিম মনীষীদের যৌথ সুরক্ষা ব্যূহ দেখে ওরা নিরাশ হয়ে পড়লো। পাকিস্তানের পেশোয়ারে মুজাহিদ হাই কমান্ড পরামর্শে বসলেন। আফগান নেতৃবৃন্দের সহায়তা করার উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জিহাদী জযবা নিয়ে যেসব ঝানু ঝানু ব্যক্তি আফগান রাণাঙ্গনে ছুটে এসেছেন, তাঁদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিরাও রয়েছেন এ পরামর্শে। প্রভাবশালী মুজাহিদ নেতা ও সাত দলীয় মুজাহিদ ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদু রাব্বির রাসূল সাইয়াফের প্রধান উপদেষ্টা, ফিলিস্তিনী নাগরিক জনাব তামীম আল-আদনানী শেভার্দনাদজের সাথে কূটনীতির ময়দানে পাঞ্জা লড়লেন খুব সফলভাবে। ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা পিএলও'র সাবেক নেতা তামীম আল-আদনানী ও তাঁর আরব সহযোদ্ধাদের মাথার সাথে জাতিসংঘ দূত, সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্য সালিশানরা কুলিয়ে উঠতে না পেরে অন্য পথ ধরার সুপারিশ করলেন।

সম্মুখসমরে পরাভূত, আলোচনার টেবিলে, কূটনীতির দাবার চালে পরাজিত শয়তানচক্র এবার নয়া পথ অবলম্বন করলো। এ পথকে অবশ্য নয়া বলা যায় না। কেননা, যুক্তিতে হেরে গিয়ে শক্তির পথ বেছে নেয়া নতুন কোন ঘটনা নয়। বিশ্বের প্রতিটি অপশক্তি বা আদর্শিকভাবে দুর্বল মতবাদ শক্তির পথ বেছে নিয়ে থাকে।

প্রতি ফ্রন্টেই প্রতিরোধ

কূটনীতির পাশাপাশি শুরু হলো প্রচারণার লড়াই। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর মার্কিনরা বিপদগ্রস্ত আফগান জনতাকে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু এতোবড় একটা পরাশক্তিকে মুজাহিদরা যে এ ধরনের একটা রাম ধোলাই দিলো, এটা দেখে মার্কিনীদেরও খুব একটা ভালো লাগলো না। বিশ্বের মুসলিম স্বার্থবিরোধী প্রতিটি হবু পরাশক্তি বা উদীয়মান সুপার পাওয়ার ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়লো। যে করেই হোক, আফগানিস্তানের জিহাদী অগ্রযাত্রা রোধ করতেই হবে। এ জন্যে তারা সবচেয়ে প্রচারণার মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে এবং আফগান জাতির ঈমানদীপ্ত উত্থানের ফলে বিশ্ব মুসলিম জাতির হৃদয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার অংকুরিত বীজটিকে শুরুতেই পিষে ফেলার চেষ্টা চালালো।

আমেরিকা, ইউরোপের সকল সংবাদ সংস্থা, সম্প্রচার কেন্দ্র ও তাদের সাহায্যপুষ্ট মুসলিম দেশের সংবাদপত্রগুলোতেও মুজাহিদদের বিজয়কে চেপে যেতে লাগলো। তাদের হাতে মারা পড়া কমিউনিস্ট সৈন্যদের সংখ্যার চেয়ে বরং শহীদ মুজাহিদদের সংখ্যাটা বেশি ফলাও করা হতে লাগলো। মুজাহিদদের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষের বানোয়াট সংবাদ ছাপা হতে থাকলো। ঢাকার সংবাদপত্রেও দেখা গেলো দুই ধরনের সংবাদভঙ্গি। কতিপয় পত্রিকা মুজাহিদদের "বিচ্ছিন্নতাবাদী আফগান গেরিলা" নামে অভিহিত করলো। মধ্যপ্রাচ্যেও চললো একই খেলা।

এ সময় আফগান মুজাহিদদের মাঝে লুকিয়ে থাকা একটি প্রতিভা ঝলসে উঠলো। আরব থেকে জিহাদের টানে ছুটে আসা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও মাল্টি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডঃ আবদুল্লাহ আয্‌যাম ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। আমার এ বইয়ে উল্লেখিত বহুসংখ্যক তথ্য ও অলৌকিক ঘটনা আমি ডঃ আবদুল্লাহ আয্‌যামের বইপত্র ও পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছি।

ইসলামী চিন্তা-চেতনা, কুরআন-সুন্নাহর আলোকরশ্মি ও জিহাদের প্রাণশক্তি নিয়ে যে মুজাহিদ শক্তির সগৌরব উত্থান গোটা বিশ্বের ১২৫ কোটি উম্মতে

মুহাম্মদীর হৃদয়ে নতুন আশার আলো জ্বালাতে যাচ্ছে, তার উত্থান রহিত করে আশার আলোকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে সংঘবদ্ধ তাগুতী শক্তির প্রচারণার তুফানকে শক্ত হাতে মুকাবিলা করার লক্ষ্যে ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম একদল সুদক্ষ কর্মী নিয়ে প্রকাশনার কাজে নামলেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বই বের হলো অনেক। আরও অনেক অনেক বই, কয়েকটি পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন। একাধিক রেডিও সেন্টার চালু করলো মুজাহিদরা। তাছাড়া মুজাহিদদের বাস্তব অবস্থার ভিডিও ক্যাসেট ও ছবির এলবাম গোটা বিশ্বময় ছেড়ে দেয়ার কাজও এগিয়ে চললো। গোয়েবলসের উত্তরসুরি মিথ্যাচারীদের অপপ্রচারের একতরফা ধারা পাল্টে দিয়ে মুসলিম বিশ্বে নতুন একটি প্রচারণার স্রোত সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন এই সফল ব্যক্তিটি।

এবার অন্য রকম পন্থা

মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন শায়খ তামীম আল-আদনানী। খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হলো। জরুরী ভিত্তিতে তাঁকে পাকিস্তান সরকার আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলো। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বেঁচে থাকলে হয়তো আমেরিকার শত আগ্রহ সত্ত্বেও শায়খ আদনানীকে আমেরিকায় পাঠাতেন না। বোধগম্য কারণেই আমেরিকার হাসপাতালে শাহাদাতবরণ করলেন এই মহান কূটনীতিক ও রাজনৈতিক প্রতিভা। তিনি তখন পেশোয়ারে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী আফগান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সাইয়াফের তিনি রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

জুমার নামাযে যাওয়ার পথে মসজিদের প্রায় কাছাকাছি গাড়ী বোমায় শহীদ হলেন ডঃ আবদুল্লাহ আয্যাম। সাথে তাঁর দুই পুত্র। একজন পেশোয়ারেই থাকে। অন্যজন আগের দিন তাঁদের মাতৃভূমি ফিলিস্তীন থেকে জিহাদের দেশে এসে পৌঁছেছিলো মাত্র। শক্তিশালী বোমায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় ডাঃ আয্যাম ও তাঁর দুই পুত্রের দেহ।

ডঃ আয্যাম গাড়ী চালাচ্ছিলেন। এক ছেলে ছিলো পেছনে বসা। অন্যজন ফ্রন্ট সীটে। যুদ্ধক্ষেত্র, কূটনৈতিক অঙ্গন ও প্রচারণার প্রাঙ্গণ সব হারিয়ে ইসলামের দুশমনেরা এবার কাপুরুষোচিত পন্থায় জিহাদের মূল চালিকাশক্তিগুলো একে একে খতম করে দেয়ার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে লাগলো। সবচেয়ে মজার

ব্যাপার হলো, এসব হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইহুদী-খৃষ্টানদের কোন প্রচার মাধ্যমে তেমন গুরুত্ব পেলো না। এদিকে দীর্ঘদিন মুজাহিদদের অগ্রগতি বন্ধ থাকায় দুনিয়ার মুসলমান আফগান জিহাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হয়ে উঠলো। বড় বড় নেতা, মূল্যবান মাথাগুলোর জীবন নিয়ে মুজাহিদরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। আর এতে রণাঙ্গনে তাঁদের তৎপরতা কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হলো। সোভিয়েত সৈন্য চলে যাওয়ার পরও মুজাহিদদের বিজয়ে এতো বিলম্ব হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ।

নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার। বিশ্ব ইসলামী জিহাদ আন্দোলন–যা প্রতিটি মুসলিম জনপদের সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন হিসেবে পরিচিত হারকাতুল জিহাদিল ইসলামীর ভূতপূর্ব আমীর এ মাওলানা ইসলামাবাদে তাঁর অফিসে যাচ্ছিলেন। গোটা উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে জিহাদী চেতনার পুনরুজ্জীবনে এ মাওলানার ভূমিকা ছিলো চোখে পড়ার মতো। অতএব,তিনিও কমিউনিস্টদের হত্যা পরিকল্পনার শিকার হলেন। জনশূন্য রাজপথ। গাড়ীর স্পীডোমিটারের কাঁটা যখন ৬০ পেরিয়ে গেছে, তখনি ঘটলো দুর্ঘটনা। একই সাথে খুলে বের হয়ে গেলো গাড়ীর সামনের চাকা। ফ্রন্ট হুইল না থাকায় গাড়ীর চেসিস বসে পড়লো মাটিতে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে। ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে লাগলো গোটা গাড়ীটা। তিন চারবার রাস্তাময় চক্কর কেটে একসময় গাড়ীটা রাস্তার পাশে গিয়ে পড়লো। সামনের উইন্ডস্ক্রীন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ছিটকে পড়লো মাওলানার সারা দেহে। তাঁর চেহারা ও গোটা দেহ ভাঙ্গা কাঁচের গুঁড়োয় ফালা ফালা হয়ে গেলো। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হলো। অনেকগুলো অপারেশনের পর তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রাণে বেঁচে গেলেন। দুর্ঘটনার কদিন পর তিনি আশংকামুক্ত হলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর কেবিনে যেতে দেয়া হলো।

অন্তর্ঘাতমূলকভাবে কমিউনিস্টরা গোপনে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার যে প্রক্রিয়া বেছে নিয়েছিলো, এরই অন্যতম শিকার ছিলেন মাওলানা সাইফুল্লাহ্ আখতার। ঘটনার পর কিছুটা সুস্থ হয়েই তিনি যখন বাংলাদেশে এলেন, তখন আমার সাবেক কর্মস্থল চট্টগ্রামে তাঁর সাথে আমার দেখা। চেহারায় সেলাইয়ের কিছু দাগ দেখতে পেয়ে আমি কারণ জানতে চাইলাম, তখন তিনি নিজেই এ কাহিনী আমাকে শোনালেন।

"কেবিনে আমি সবেমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে উঠে বসেছি। আপনার ভাবী এলেন আমাকে দেখতে। কেবিনে উঁকি দিয়েই তিনি বোরকার নেকাব টেনে অন্যদিকে ফিরে দাঁড়ালেন। ভীষণ চমকে উঠেছেন আমাকে দেখে। আমিও তো সীমাহীন বিস্মিত হয়েছি এ অবস্থা দেখে। কিছু না বুঝতে পেরে আমি তাকে নাম ধরে ডেকে বললামঃ কি হলো, তুমি এমন করছো কেনো? আমাকে চিনতে পারনি বুঝি? এবার আপনার ভাবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেনঃ সারা চেহারা জুড়ে এতোসব ব্যান্ডেজ আর দাড়ি শেভ করা অবস্থায় আপনাকে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ভুল করে অন্য কোন রোগীর কেবিনে ঢুকেছি মনে করে মুখ ঢেকে ফেলেছিলাম।" উল্লেখ্য যে, চেহারা সেলাই করার সময় ডাক্তাররা অজ্ঞান অবস্থায় তাঁর দাড়ি শেভ করেন।

খুব সুন্দর উর্দূতে কথাগুলো আমাকে শোনালেন পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত এ তরুণ মুজাহিদ। আগের রাত্রে কোন গুপ্তঘাতক তাঁর গ্যারেজে ঢুকে গাড়ীর চাকার নাটগুলো খুলে রাখে।

অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার এক পর্যায়ে মুজাহিদরা যখন পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া শুরু করলো, তখন শয়তানও তার পলিসি পরিবর্তন করলো। পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করেও কমিউনিস্ট ও তাদের স্বগোত্রীয়রা যখন বিজয়ের নাগাল পেলো না, তখন শুরু করলো নতুন ষড়যন্ত্র। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের একটি অংশকে আপস ফর্মুলার প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিলো এবারকার চক্রান্ত।

পবিত্র কাবার ছায়ায়

রণাঙ্গন কূটনীতি ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, এর একটিতেও জুৎ না করতে পেরে কমিউনিস্টরা ও তার বন্ধু শক্তিগুলো চরম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। মুজাহিদদের কল্পনাতীত পরাক্রম দেখে আমেরিকা-ইউরোপও উৎকণ্ঠিত। সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের বেশ কিছুদিন কূট-চক্রান্তের মারপ্যাঁচে জিহাদের গতিরুদ্ধ করতে চেষ্টা করে দুশমন যখন হতাশ, যখন আফগান মুজাহিদদের পরম বন্ধু ও অভিভাবক পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় শাহাদাতবরণ করলেন, যখন শহীদী কাফেলায় যুক্ত হলেন কূটনীতিক আল-আদনানী, অমরত্বের আবে হায়াত পান করতে হলো প্রচার ও প্রকাশনা প্রতিভা, লেখক, সাংবাদিক ডঃ আয্যাম ও তাঁর দুই নবীন বয়সী পুত্রকে, তখন

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব পূর্ণরূপে অনুধাবন করে সজাগ হয়ে উঠলো জিহাদী কাফেলা। সব দিক সামলে নিয়ে পুনরায় প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ চালানো হলো নাস্তিক খোদাদ্রোহীদের ঘাঁটিতে। মুজাহিদদের নেতৃত্বে ক্রমেই ছোট হয়ে এলো শয়তানের ভুবন। সাঁড়াশি আক্রমণ পরিচালনা করছেন আল্লাহওয়ালা মুজাহিদ নেতাগণ। মহা আতংকে কেঁপে উঠতে লাগলো নজীবুল্লাহর বক্ষ। এই বুঝি কাবুলের পতন হলো মুজাহিদ-জনতার হাতে। সে ভাবলো, কমিউনিস্টদের কেবলায় দারুণ ভূকম্পন। ক্রেমলিনে শুরু হয়েছে অসন্তোষ। মস্কোর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের কর্ণধাররা যখন নিজেদের ঘরের আগুনেই জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছে, তখন কাবুলের চার দেয়ালে আটকে পড়া পুরানো গোলাম নজীবুল্লাহর জন্যে তারা কতোটুকু কি করতে পারবে?

এ ভাবনায় অস্থির জেনারেল নজীবুল্লাহ মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কাছে প্রস্তাব পাঠায় যে, পবিত্র মক্কা শরীফের পবিত্র হেরেমে কাবাঘরের ছায়ায় বসে সে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করতে আগ্রহী। কিন্তু মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির গাদ্দার, সোভিয়েত রাশিয়ার আজ্ঞাবহ গোলাম ও আফগানে গণহত্যার নায়কের সংবেদনশীল মিষ্টি প্রস্তাবে ভুললেন না। কারণ, "ফান্দে পড়িয়া যে বগায় কান্দে", সে আবার তার ত্রাণকর্তার চোখও তুলে নিতে পারে সুযোগ পেলে। মুজাহিদরা জবাব দিলো, আল্লাহর ঘরে বসে তোমার মতো খুনী নরপশুর সাথে আলোচনা করলে ২০ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে, ৬০ লক্ষ শরণার্থী ও অসংখ্য যুদ্ধাহত পঙ্গু আর লাঞ্ছিত মা-বোনের সাথে বেঈমানী করা হবে। অতএব, আলোচনার সকল পথ এখন বন্ধ। মুজাহিদদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে অতীত অপরাধের তওবা ছাড়া তোমার আর কোন গত্যন্তর নেই। মস্কো বা ওয়াশিংটন কেউ-ই তোমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। তাছাড়া খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়ার দরুন আফগান জনতাও তোমাকে আশ্রয় দেবে না। মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ কথা আফগান জনতার মুখস্থ।

আফগান মুজাহিদদের প্রবাসী সরকার

পাকিস্তানের পেশোয়ারে আফগান শরণার্থীরা থাকতেন। তাদের অবস্থানকে ভিত্তি করে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

পেশোয়ারে বসেই আঞ্জাম দিতেন। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রবাসী আফগান সরকার। এর প্রেসিডেন্ট হন ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্ মাসউদ। যাঁকে পানশিরের সিংহ বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী উস্তাদ সাইয়াফ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান বিপ্লবী মুজাহিদ নেতা ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ার। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসির আইনমন্ত্রী। কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। অধ্যাপক রাব্বানী, মাওলানা আরসালান খান রহমানী, সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী, মাওলানা ইউনুস খালেস–এঁরা সবাই দায়িত্বশীল মন্ত্রী বা উপদেষ্টা। মুজাহিদ প্রবাসী সরকার থেকে নিরাপোষ মুজাহিদ নেতা হিকমতইয়ারকে সরানোর পর আমেরিকা এমন সব শর্ত ও পলিসি এ সরকারের উপর সওয়ার করাতে শুরু করলো, যার দরুন গোটা আফগান জিহাদের চেতনাই কলুষিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। আফগান জাতির বিপ্লবী উত্থান রহিত হতে এ ধরনের দু'একটি শর্তই যথেষ্ট। অবস্থা আঁচ করতে পেরে মাওলানা ইউনুস খালেস ও সাইয়েদ আহমদ গীলানী সরকার থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন। শত শত মুজাহিদ কমান্ডার পেশোয়ারে অবস্থিত প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ডের অস্পষ্টতায় দারুণভাবে হতাশ হয়ে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের পথ বেছে নিলেন লড়াই আর লড়াই। কাগজ-কলম আর আলাপ-আলোচনা নয় মেশিনগানই দেবে ফয়সালা।

বিপ্লবী বনাম নিস্তরঙ্গ কর্মপন্থার দ্বন্দ্ব

প্রবাসী সরকারের একটি অংশ আলাপ-আলোচনা, বিশ্ব-সভার মতামত, আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহের তোয়াক্কা, পরাশক্তিগুলোর পলিসি, আরব ও মুসলিম বিশ্বের সিগন্যাল ইত্যাদির প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হয়ে ধীর গতিতে লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাওয়ার যে পন্থা অবলম্বন করতে চাইলো, হিকমতইয়ারের নেতৃত্বাধীন একটি গ্রুপ তা মানতে চাইলো না। এ গ্রুপের কথা হলো, পৃথিবীর সকল কায়েমী স্বার্থবাদের শরীরে তীব্র কষাঘাত হেনে জিহাদের প্রদীপ্ত পথ বেয়েই পৌঁছতে হবে মনযিলের শৃঙ্গ চূড়ে। ছোট একটি দল ইরানের সাথে দহরম-মহরমে মেতে উঠলো। একজন নেতা তার দলবল মস্কো গিয়ে আলাপ-আলোচনার নিমন্ত্রণ কবুল করে ফেললেন। গ্লাস্তনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা নামক অস্ত্রোপচারে যখন সমাজতন্ত্রের গোদের উপর জন্ম নেয়া ব্যর্থতার বিষফোঁড়া সারাতে যেয়ে গর্বাচেভের রোগী মারা যায় যায় অবস্থা, তখন এই মৃত্যুশয্যাশায়ী ডুবন্তপ্রায় পরাশক্তির রাজধানীতে গিয়ে

আলোচনায় বসে সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্ব বাড়ানোর কোন যৌক্তিকতাই খুঁজে পেলেন না অন্য মুজাহিদরা। অথচ বিশেষ গ্রুপের জনৈক নেতা মস্কো গিয়েই ছাড়লেন। এ থেকেই আফগান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের "আপস-নিরাপস" ভিত্তিক দু'টি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

হিকমতইয়ার, সাইয়াফ, হাক্কানী, আরসালান ও খালেস কেউই আপসের কথা শুনতে রাজী নন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আর তরবারির ফয়সালাই তাঁদের কাম্য। অথচ রাব্বানী, মাসউদ, মোজাদ্দেদী শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানের মত প্রকাশ শুরু করলেন। অত্যন্ত সুন্দরভাবে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের কাজ এগিয়ে নিলেন। তবে চিন্তার ক্ষেত্রে দু'টো ধারা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। এ সময় জিহাদের গতিও কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলো। ইহুদী-খৃষ্টান ও নাস্তিক্যবাদের এজেন্টদের সম্মিলিত চক্রান্তে নেতাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ার অতি ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আঁচ করেই জিহাদের ফিল্ড কমান্ডাররা নতুন উদ্যোগে ময়দানী তৎপরতা শুরু করে সবাইকে রণাঙ্গনমুখী করে তুললেন।

একই সাথে শুরু হয়ে গেলো খোস্ত, জালালাবাদ, উরগুন ও কাবুলের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ। উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসির (আইন ও বিচারমন্ত্রী) বাংলাদেশের গৌরব কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী (যশোর), হযরত হাফেজ্জী হুযুরের পৌত্র হাফেয রহমতুল্লাহ (ঢাকা) সহ শত শত মুজাহিদের শাহাদাতে, তাঁদের রক্তের প্রতিটি কণিকায় আফগানিস্তানের স্বাধীনতার সূর্য ধীরে ধীরে রক্তিমাভ হয়ে উঠছিলো। আর নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের স্বর্গসৌধের গা থেকে খসে পড়ছিলো একটি একটি করে ইট। ঢিলে হয়ে আসছিলো তাগুতের দুর্বিনীত আসুরিক পেশী। তলিয়ে যাচ্ছিলো সর্বহারার স্বর্গরাজ্যের উদ্ধত কালনাগ আর ভয়াল থাবা বিস্তার করে লাফিয়ে পড়া সমাজতন্ত্রের হিংস্র দানব। আফগান মুজাহিদদের বিজয় শুধু কাবুল মুক্ত হওয়া বা আফগানিস্তানের স্বাধীনতাই নয়; বরং আধা দুনিয়ার নিয়ন্তা, নাস্তিক্যবাদী পশুশক্তির সমাধি রচনাও এসব জিহাদী পুণ্যাত্মারই মহাবিজয়। শাহাদাতের রক্ত সিঞ্চন করা হয়েছে আফগান ভূখণ্ডের পাথুরে যমীনে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে মধ্য-এশিয়া থেকে পূর্ব-ইউরোপ পর্যন্ত গোটা সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীতে।

ওয়াশিংটনে হিকমতইয়ার

যুদ্ধ চলাকলে একবার হিযবে ইসলামী নেতা গুলবদন হিকমতইয়ার গেলেন ওয়াশিংটনে। নিঃশর্তভাবে কোন সহযোগিতা আমেরিকা থেকে গ্রহণ করা যায় কিনা তিনি তা ভাবছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম কমিউনিটির সাথে তিনি মতবিনিময় করবেন। প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁকে হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ জানালেন। হিকমতইয়ার জানালেন, আমি মস্কোর সাথে লড়াই করছি বলে এ কথা ভাবার অবকাশ নেই যে, আমি ওয়াশিংটনের সাথে হাত মেলাবো। পরাশক্তি হিসেবে তাদের সাথে বৈরিতা থাকলেও ইসলামের ব্যাপারে ওরা উভয়েই সমান খড়গহস্ত। মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "আলকুফ্‌রু মিল্লাতুন ওয়াহেদা" সমস্ত কুফরীশক্তি এক এবং অভিন্ন জাতিসত্তা।

রাত সাড়ে ন'টা। ওয়াশিংটনের হোটেল কক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছেন বিপ্লবী মুজাহিদ নেতা হিকমতইয়ার। কেউ দরজায় নক্ করছে। অতি সাবধানে দরজাটা খুললেন তিনি। দৃষ্টি তাঁর উন্মীলিত, ললাটে আত্মমর্যাদার জ্যোতি, কোমরের বেল্টে ঝুলানো পিস্তলের বাঁটে রাখা একটি হাত। কি মনে করে এখানে এসেছেন আপনি, আপনার পরিচয়? দরজায় দাঁড়ানো মার্কিন তরুণীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটি করলেন তিনি। মেয়েটি খুব সিরিয়াসলি বললোঃ মিঃ হিকমতইয়ার! আমি একাই এসেছি হোটেলে। আপনার কক্ষে বসে একটু আলাপ করতে চাই। অতি গোপনীয় কথা। আমাকে আমার বাবা আপনাকে হোয়াইট হাউজে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। আমি প্রেসিডেন্টের কন্যা। নিজের হোটেল কক্ষে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্টের কন্যারত্নকে দাঁড়ানো দেখে তিনি বললেনঃ দেখুন, আমি আগেই না করে দিয়েছি। আমি ইসলাম ও মুসলমানের কোন দুশমনের সাথেই বন্ধুত্ব রাখতে রাজী নই। তাছাড়া আমার এ হাতটি দিয়ে আমি ৬৫ হাজার মুজাহিদকে জিহাদের বায়আত করিয়েছি। আমার জীবন থাকতে আমি ইসলামের এক জঘন্য শত্রু, একটি পরাশক্তির কর্ণধারের হাত স্পর্শ করতে পারি না।

মিশন ব্যর্থ। ফিরে গেলেন প্রেসিডেন্ট তনয়া। "সোভিয়েত ইউনিয়নের গর্ব খর্বকারী, অন্যতম পরাশক্তির দর্পচূর্ণকারী এই মর্দে ফকীরদের বাগ মানানোর কোন উপায়ই নেই।" এ বাস্তবটি বুঝে নিতে খুব একটা দেরী হলো না মার্কিন নেতৃবৃন্দের। ইনকিলাব গ্রুপের অন্যতম প্রকাশনা সাপ্তাহিক পূর্ণিমার "সমকালীন সংলাপ" কলামে এ ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে।

ঢাকায় হিকমতইয়ার

প্রবাসী আফগান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ার প্রবাসী মুজাহিদ সরকারের প্রতি মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশে বিভিন্ন দেশ সফর শুরু করেন। সর্বপ্রথম আসেন ঢাকায়। হোটেল শেরাটনে এ বাঘা মুজাহিদদের সাথে ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদরা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। পরাশক্তিগুলোর বলয় ও আওতাধীন মুসলিম দেশগুলোর নির্জীব-নিষ্প্রাণ সরকারগুলোর মধ্যেই ছিলো আমাদের সরকারের ভূমিকা। আমেরিকার অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর বহু মুসলিম রাষ্ট্রই পাতের ভাজা মাছটিও উল্টে খায় না। পরাশক্তিগুলোকে মুনাফিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ প্রায় খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে। কেবল আফগান জনতাই এসব কাগুজে বাঘের মুখোশ উন্মোচন করে দেখিয়ে দিলো।

জেনারেল এরশাদের প্রতি হিকমতইয়ার

তখন সময়টা ছিলো রাষ্ট্রপতি এরশাদের স্বীকৃতি না দিলেও তিনি সংগ্রামী এই মুজাহিদ নেতার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। বিদায়ের সময় গুলবদন হিকমতইয়ার জেনারেল এরশাদকে একটি রিভলবার উপহার দিয়ে বলেছিলেন, "দুনিয়ার সমস্ত পরাশক্তির সাথে পাঞ্জা লড়ার সাহস নিয়ে হাতিয়ার তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত ঈমানদারের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় না। জিহাদই মুসলিম জাতির গৌরব ও আত্মমর্যাদার চাবিকাঠি।" বাংলাদেশে তাঁর সফর ফলপ্রসূ না হওয়ায় তিনি মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর

শেরাটনের সংবাদ সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিক হিকমতইয়ারকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি সব সময়ই নিরাপস। জিহাদ ছাড়া আপনি কিছু বুঝেন না। আলাপ-আলোচনার যে প্রস্তাব বিশ্ব নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আসছে, সেসবেও আপনি রাজী হতে পারছেন না কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, দেখুন ভাই! বিশ্বের মোড়ল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের ভেতর কিছুমাত্র ইনসাফ নেই। ওরা এক মুহূর্তের জন্যও মুসলমানদের কল্যাণ চায় না। প্রথম যখন আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন হয়, তখন মোড়লেরা কোন কথা বলেনি। ২০ লক্ষ আফগানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, ওরা মুখ খুললো না। এখন আফগান জনতা যখন

দখলদার ও তাদের দোসরদের মার লাগাচ্ছে, তখন মোড়লেরা শান্তির আলাপ নিয়ে এসেছেন। আমার বাড়ীতে যদি ডাকাত আসে, আমার পরিবারের লোকজনকে হত্যা করে, ধর্ষণ, লুটতরাজ, নির্যাতন, চালায়। এরপর যদি আমি ডাকাতদের কাবু করতে সক্ষম হই, তখন যদি ডাকাত বলতে থাকে যে ভাই, সহিংসতা ও রক্তপাতের পথ পরিহার করে চলো আমরা আলোচনায় বসি। এটা কেমন মজার ব্যাপার আপনারাই বলুন! আমরা এখন ঠিক সে পর্যায়েই আছি। সোভিয়েত রাশিয়া এখন গৃহস্থের হাতে বন্দী ডাকাতের মতো। আমেরিকা-ইউরোপের ছোট-বড় মাঝারি শয়তানগুলো হলো ডাকাতের সহায়ক শক্তি। অতএব, এ ক্ষেত্রে আমার আপসহীন পলিসিই সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর।

মালয়েশিয়া ও সউদী আরব সফর শেষে হিকমতইয়ার পাকিস্তানে ফিরে যান। এক পর্যায়ে বিশ্ব-শয়তানচক্রের আঙ্গুলি নির্দেশে আপসহীন এ নেতাকে প্রবাসী মুজাহিদ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্বের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। প্রবাসী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে। জিহাদের ময়দানে তখন শুধু কিন্তু কমান্ডাররা তৎপর। দায়িত্বের বোঝা মুক্ত গুলবদন হিকমতইয়ারও তাঁর সুশিক্ষিত ৭০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সকল বাধা তুচ্ছ করে

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর প্রতিরোধ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ সংগ্রাম-সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। জিহাদ পরিচালনা ও নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যে সাতটি দলের প্রধান সাত জন আমীর ছিলেন, তাঁরা সবাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, শাহাদাতের অপার নেশা, স্বাধীনতা ও বিজয়ের অমিত আশা, বিশ্বমুসলিম জাতির পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন নিয়েই জিহাদ জারি রেখেছিলেন। শয়তান ও তার সমমনা মানুষগুলোর শত কৌশলেও এঁদের মধ্যে মতানৈক্য বা আন্তরিকতার অভাব সৃষ্টি হতে পারেনি। মতভেদ হলেও মতবিরোধ হয়নি। আল্লাহর অসীম রহমতে এসব মুজাহিদ নেতার অনুগামী লাখো আফগান, আরব ও অন্যান্য মুজাহিদ নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংস। সমাজতন্ত্রের মৃত্যু। ক্রেমলিনের পতন। কমিউনিজমের পিতৃ-পুরুষদের ভাস্কর্য, মূর্তি আর প্রতিকৃতির অবমাননাকর অপসারণ।

আফগান মুজাহিদরাও তাদের দেশে বিপদ-মুসীবত কম দেখেননি। নিজের দেশের বিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, ষাট লক্ষ মানুষের হিজরত, অসংখ্য নাগরিকের

পঙ্গুত্ব, অগণিত মা-বোনের অসম্মান, সুখী-সুন্দর দেশটিতে কিয়ামতের তাণ্ডব, সবকিছুই আফগানদের দেখা। এতোসব দেখে-শুনে মুজাহিদরা হয়ে উঠেছিলেন দুর্দম অভিযাত্রী। অপরাজেয় শক্তি। জিহাদের নেতৃত্বে যদি কখনো ষড়যন্ত্রীদের বদনজর লেগে কিছুটা ঝামেলার সৃষ্টিও হতো, সাধারণ মুজাহিদ ও ফিল্ড কমান্ডাররা তখন নীতিনির্ধারণী কর্তৃত্বের দিকে চেয়ে থেকে সময় নষ্ট না করেই সামনে এগিয়ে যেতেন। চলতো হামলা। আসতো বিজয়। একের পর এক ঘাঁটি হতো পদানত। মুজাহিদদের একটি গ্রুপ একবার পতনের বেলাভূমিতে দাঁড়ানো মস্কোয় গিয়ে চুক্তি করে এলো। যখন শতকরা ৯৫ ভাগ বিজয় মুজাহিদরা অর্জন করে ফেলেছেন। শুধু গ্যারিসন শহর ও রাজধানীতেই কেবল শত্রুরা ইঁদুরের মতো কালক্ষেপণ করছে। শীত মওসুম, প্রচণ্ড তুষারপাত ও দুর্গম পথঘাটই মুজাহিদদের সামনে কঠিন সমস্যা। তাঁরা সর্বশক্তি সঞ্চয় করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বসন্ত ও গ্রীষ্মের। সুদিন এলেই শুরু হবে চূড়ান্ত আক্রমণ। এমনি লগ্নে মস্কো গিয়ে আলোচনায় মিলিত হওয়া কোন যুক্তিতেই তারা মানতে পারলেন না হিকমতইয়ার। তিনি বললেনঃ এ তো পরাজিত ও বিতাড়িত দুশমনের মান বাড়ানো। আফগান জিহাদের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবশালী ফিল্ড কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী পরিষ্কার ঘোষণা দিলেন, জমিয়ত প্রধান রাব্বানীর সাথে মস্কো কর্তৃপক্ষের চুক্তি তিনি ও তাঁর লক্ষাধিক মুজাহিদ মানতে রাজী নন। তিনি এবং হিকমতইয়ার তখন শুধু রণাঙ্গনেই সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন। ওয়াশিংটন বা মস্কোর রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় নয়।

মাওলানা হাক্কানীর মস্কো চুক্তি প্রত্যাখ্যান

আফগান মুজাহিদ নেতা মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী মস্কো চুক্তি প্রত্যাখ্যানের চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বললেন, আফগান জনগণ ও মুজাহিদদের ঘাতক নজীবুল্লাহর চরম পরিণতি ও তার কমিউনিস্ট সরকারের পুরোপুরি উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

তিনি আফগান সমস্যা প্রসঙ্গে জাতিসংঘের পাঁচটি প্রস্তাবকেই সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেন। আফগানিস্তানের কতিপয় নেতার মস্কো সফর ও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির নিন্দা করে তিনি বলেন, আফগানিস্তানের তওহীদী জনতা ও সাধারণ মুজাহিদরা মস্কো চুক্তি মানে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার মাঝামাঝি সময়কালটিতেই তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের অস্ত্রহ্রাসের আহ্বানের প্রেক্ষিতে ঢাকার একটি পত্রিকায় যে সম্পাদকীয়টি আমি লিখেছিলাম, তা নিম্নে উল্লেখ করছি। কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকেরা সবাই এক গোষ্ঠী, মুসলিম জাতির শত্রুতায় সর্বদা ঐক্যবদ্ধ, তাতে এ সত্যটিই ফুটে উঠবে।

মুসলমানকে দাবিয়ে রাখার কূট-কৌশল

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেকগুলো খৃষ্টান রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিশ্ব দরবারের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোর স্বাধীনতা ইহুদী, নাসারা ও নাস্তিকচক্র মেনে নিতে পারছে না। এর অনেক কারণ। সোভিয়েত মুসলিম প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কিরঘিজিয়া ইত্যাদি একসময় ছিলো মুসলিম মিল্লাতের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রশাসনের কেন্দ্র। শত-সহস্র ইসলামী ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন মধ্য-এশিয়া ও অখণ্ড তুর্কিস্তানের এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

অতএব, কোনক্রমেই মুসলিম জাতির এহেন উর্বর ভূমি তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র নামক অবাস্তব এবং প্রকৃতিবিরোধী একটি মতবাদ বাস্তবায়নের প্রায় শতাব্দী ব্যর্থ প্রচেষ্টাকালে এ অঞ্চলটিকেই বেশি শোষণ করেছে। কমিউনিজমের পাণ্ডারা মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্বীনদার বাসিন্দাদের উপরই বেশি নিপীড়ন চালিয়েছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রী নরপশুদের প্রতি এ অঞ্চলের মজলুম মানুষের প্রতিশোধস্পৃহাও তুলনামূলক বেশি। অতএব, সোভিয়েত মুসলমানদের স্বাধীনতার ক্ষতিকর প্রভাবের ভয়ও মস্কোর নেতৃবৃন্দের মনে প্রকট।

বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে তার যৌবনে অবস্থানরত, তখন রাজধানী মস্কোসহ তার ইউরোপীয় এলাকাসমূহ পরের ধনেই পোদ্দারী করেছে। কেননা, জনশক্তি, মেধা, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সবকিছুরই অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম প্রজাতন্ত্রসমূহ কমিউনিস্ট বাঁদরদের অর্থ ও শক্তির যোগান দিয়েছে। কয়লা, লোহা, ইউরেনিয়াম, পেট্রোলিয়াম, ফল, ফসলে সমৃদ্ধ মুসলিম প্রজাতন্ত্রসমূহের অবর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন দেউলিয়া দার্শনিক। তদুপরি সুপার পাওয়ার(?) সোভিয়েত

ইউনিয়নের বিপুল সমরশক্তি যুদ্ধ সরঞ্জামও মুসলিম এলাকায়ই রয়েছে। যেগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে রাশিয়া হয়ে পড়বে নিরস্ত্র মহাযোদ্ধা। আর সবচেয়ে বড় আশংকার কথা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা যদি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানোর পাশাপাশি এতো বড় সমর সরঞ্জামের মালিক হয়, তবে বিশ্ব শয়তানমণ্ডলীর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?

অতএব, যেকোন মূল্যে সোভিয়েত মুসলমানদের স্বাধীনতা রুখতেই হবে, ঐক্য ঠেকাতেই হবে। কিছুতেই ওদের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না এতো বিরাট সামরিক শক্তি। তাই অতি সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা দিয়েছেন ব্যাপক অস্ত্রহ্রাসের। তবে শর্ত হলো, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকেও এ বিষয়ে সমান ভূমিকা পালন করতে হবে। সারা বিশ্বময় বুশের এই ঘোষণায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেলেও মুসলিম বিশ্বের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ ঘোষণার মূল প্রেরণার উৎসটি খুঁজে পেয়েছেন ঠিকই। আর সেটি হলো, দু'দিন আগে পরে সোভিয়েত মুসলমানরা স্বাধীনতার সূর্য কেড়ে আনবেই। আর তখন সে এলাকার অস্ত্রগুলো আমেরিকার বিশ্ব মস্তানীর পথে হবে বড় একটি বাধা। সুতরাং এখন থেকেই অনুগত বন্ধু মিখাইল গরবাচেভের হাতেই অস্ত্রহ্রাস করিয়ে রাখা প্রয়োজন। আর এটা করতে গিয়ে আমেরিকারও কিছু অস্ত্রহ্রাস করতে হবে। কতোদূর থেকে খেলা চালে খৃষ্টানরা। বিশ্ব-রাজনীতির দাবার গ্রান্ড মাস্টার ইহুদীরাই তো মূলতঃ বুশের মগজের চাবি ঘুরায়। আর এদের সাথে তাল মেলায় সময়ের চাকায় পিষ্ট, অসহায় কমিউনিস্টরা। বিশ্বনবীর উম্মতকে ঘিরে সকল কাফের, মুশরিক ও খোদাদ্রোহী শক্তি আজ একজোট—"আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদা।" অতএব, বিশ্ব জুড়ে ইসলামের সৈনিকদের এখন চোখ-কান খোলা রেখে অগ্রসর হতে হবে। সদা জাগ্রত থাকতে হবে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিঃ কিছু জিজ্ঞাসা

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্টদের হাতেই টুকরো টুকরো হলো। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকটির গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের অকাল মরণ ঘটলো। পূর্ব-ইউরোপ থেকে শুরু করে মুসলিম মধ্য-এশিয়ার গোটা অঞ্চল এমনকি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রাণকেন্দ্রেও সমাজতন্ত্রের কবর রচিত হলো। দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দীকাল যাবত নাস্তিক্যবাদের

পাগলা ঘোড়া দাবড়িয়ে, কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে কমিউনিজম অবশেষে নিজের হাতেই নিজের সমাধি রচনা করলো।

এ পর্যায়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, কে এই গর্বাচেভ? তার পিতার নাম নাকি হায়দার আলী। মূলতঃ এ গর্বাচেভ তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলিম পরিবারের কমিউনিস্ট পরিচয়ধারী ছেলে। তার নামও মিখাইল। এটা কি ইসলামের আকীদামত মিকাইল (আঃ) নামক ফেরেশ্তার প্রতিই ইঙ্গিত করে? যদি তাই হবে, তাহলে প্রকাশ্যে তিনি ইসলামী সমাজ কায়েমের প্রচেষ্টা করলেন না কেন? আর তিনি যদি মুসলিম উম্মাহর সদস্য বা বন্ধুই হবেন, তাহলে তিনি সারাজীবন নাস্তিক্যবাদী পার্টি করে, বহু ঘাঁটি পাড়ি দিয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী হলেন কোন্ যুক্তিতে? সমাজতান্ত্রিক দেশে কোন মুসলমানের ছেলে তার ঈমান গোপন রেখে বেঁচে থাকতে পারলেও লাল গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট হতে পারে না। আবার তিনি সোভিয়েত নেতাও হলেন। শেষে "গ্লাস্তনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা" নামক শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে, পূর্বসূরিদের নির্যাতন ও পাশবিকতার সমালোচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব শেষ করে ফেললেন। সমাজতন্ত্রকে ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে নিক্ষেপ করলেন। কে এই গর্বাচেভ? কি তার মিশন? তিনি আসলে কি ভেবেছিলেন আর কি করে ফেললেন? এসব উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন গোটা মুসলিম বিশ্বের সচেতন নাগরিকদের মনেই কমবেশি ঘুরপাক খায়। বিশেষতঃ খুচরা কমিউনিস্টদের অন্তরে এ প্রশ্নটি অতিরিক্ত খচ্‌খচ্ করে। যেমনঃ ঢাকার জনৈক কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর এক সেমিনারে রাগে-দুঃখে চিৎকার করে বলছিলেনঃ গর্বাচেভ একটা শুয়োরের বাচ্চা। মার্কিনীদের এজেন্ট। বুশের কাছ থেকে মোটা অংকের ঘুষ খেয়ে এই বেটা বদমাশ সমাজতন্ত্রের এমন সর্বনাশটা করলো। ঘটনার তিক্ত বাস্তবতা ও আকস্মিকতার ধাক্কা সামাল দিতে না পেরেই তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবী তার স্বভাবে প্রচ্ছন্ন আদি-আসল বাক্যগুলো ঝেড়ে দিয়েছিলেন সেদিন। কম দুঃখে কি আর কেউ সাবেক গুরুঠাকুরকে শুয়োরের বাচ্চা, বদমাশ বলে গালি দেয়?

এসব জিজ্ঞাসার সহজ ও সঠিক উত্তরঃ শক্তির দম্ভ ও ক্ষমতার অহংকারে মানুষ যখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে, নিরপরাধ নারী-শিশু ও বৃদ্ধের উপর যখন শুরু করে নির্মম পাশবিকতার দুঃসহ অনুশীলন, তখন মযলুম বনী আদমের ফরিয়াদ খোদার

আরশে কাঁপন জাগায়। এরপর নেমে আসে ধ্বংস। নাস্তানাবুদ হয়ে যায় মিথ্যা অহংকারের তাসের ঘর। নিশ্চিহ্ন হয় সুপার পাওয়ার নামক বালির বাঁধ। পৃথিবীর সীমালংঘনকারী প্রতিটি সাম্রাজ্য ও পরাশক্তির পরিণতিই এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে জনৈক সোভিয়েত জেনারেলের কথা

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ নিজ হাতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে দিয়েছেন। সংস্কার নীতির কাঁচি চালিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ করেছিলেন। তার এ সিদ্ধান্তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর মতো কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত রাশিয়ায় কেন পাওয়া গেলো না? এসব জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা পেয়েছি। ১৪১২ হিজরী ১৯৯২ ইং হজ্জ মওসুমে সদ্য স্বাধীন সোভিয়েত মুসলিম প্রজাতন্ত্রসমূহের বহুসংখ্যক মুসলমান সউদী সরকারের আমন্ত্রণে পবিত্র ভূমিতে এসেছিলেন। দীর্ঘ প্রায় শতাব্দীকাল খোদাদ্রোহিতার চাকায় পিষ্ট এসব মুসলমান এতোদিন পর হজ্জের উদ্দেশে আল্লাহর ঘরে আগমনের সুযোগ পেয়ে যেন নতুন জীবন লাভ করেন। তাদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গা, সমাজতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ আফগান জিহাদের প্রাণপূর্ণ প্রতিক্রিয়া। তবে বাহ্যত যে কারণটি তারা এর পেছনে খুঁজে বের করেন; সেটি হজ্জ করতে আসা জনৈক সোভিয়েত মুসলিম জেনারেল বাংলাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, মদীনা সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সাথে অন্তরঙ্গ আলোচনার সময় উল্লেখ করেছেন। মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ বা রাবেতার সর্বোচ্চ নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা খান মিনায় রাবেতার প্রধান মেহমানখানায় পূর্বোক্ত জেনারেলের সাথে কথা বলার সময় এই সোভিয়েত সামরিক ব্যক্তিত্বটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি তাঁকে জানান, মাসিক মদীনা সম্পাদক ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে তমদ্দুন মজলিসের সীরাত মাহফিলে (১৯৯২) প্রদত্ত বক্তৃতায় তা প্রকাশ করেন। সোভিয়েত জেনারেলের বক্তব্যের মর্মকথা ছিলো এইঃ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সুযোগ্য অংশটি ছিলো মুসলিম মধ্য-এশিয়ার লোকজন নিয়ে গঠিত। উজবেক, তাজিক, কিরঘিজ ও আজারী মুসলিম রক্তধারার বাহক এসব কথিত কমিউনিস্ট (অথচ তাদের হৃদয়ে ইসলামী অনুভূতি ও চেতনার আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে ছিলো) যখন আফগানিস্তানে তাদের সেনাশক্তির চরম পরাজয় ও লজ্জাকর অপসারণ

দেখতে পেলো, তখন থেকেই তাদের মধ্যে কমিউনিজম বাদ দিয়ে স্বাধীন জাতিসত্তার চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। আর মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর সাথে সম্পর্কিত সৈন্যরা যদি সমাজতন্ত্রের জোয়াল কাঁধ থেকে নামানোর চিন্তায় বিদ্রোহ করে বসে, তবে বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তিটির কর্তৃত্বে মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অতএব, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি সাধন করে হলেও এর সুসংহত সমরশক্তি মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা রুখতে হবে, আর তাই গর্বাচেভ, ইয়েলৎসিন ও পশ্চিমা শক্তি নানা কৌশলে এ পরাশক্তিটির বিলোপ সাধন করে দিয়েছে। মূলতঃ আফগান জিহাদই এই পরাশক্তির মৃত্যুদূতের ভূমিকা পালন করেছে, জিহাদী চেতনার প্রতিচ্ছায়া মধ্য-এশিয়ার মুসলিম জনমনে পতিত হয়ে জন্ম দিতে শুরু করেছিলো নতুন এক বিদ্রোহ চিন্তার। পুনরুজ্জীবনের পরম সম্মতির। এটা আঁচ করতে পেরেই সবকিছু চুরমার করে দেয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। এতে মদদ যোগায় পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টান ও উপমহাদেশের ব্রহ্মণ্যবাদী চক্র। স্বাধীন আফগানিস্তানের মুজাহিদ সরকারের স্থিতি ও দেশের রাজনৈতিক শৃংখলা বিনাশের অবিরত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখনো তারা জিহাদী অগ্রযাত্রা রুখতে চরম প্রয়াসী। কেননা, আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত গোটা মুসলিম উম্মাহকে পুনর্বার জেগে ওঠার জন্য যেভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে, এতে করে আগামী দিনগুলোতে ইসলামী গণজাগরণের ধারাবাহিকতা ও মুসলিম জাতির বিপ্লবী উত্থানের পরম্পরা রোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। অতএব, সকল শয়তান এক হয়ে মানবতার বিজয় ঠেকানোয় উঠেপড়ে লেগেছে। অন্ধকারের রাজপুত্রেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আলোর বন্যার পথ আগলে।

চোখে-মুখে সবার নবজাগৃতির দৃঢ় সম্মতি

মহান আল্লাহ পাকের অশেষ করুণায় আমারও এ বছর (১৪১২ হিজরী, ১৯৯২ইং) পবিত্র হজ্জে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। জিদ্দা, মক্কা, মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় পৃথিবীর বহু দেশের বহু ভাষার বহু রংয়ের মুসলমান ভাইদের দেখা পেয়ে আমি সীমাহীন প্রীত হয়েছি। অনেকের সাথে কথাও হয়েছে—হয়েছে মনখোলা মতবিনিময়, উপহার বদল ও সখ্যতা। এঁদের প্রত্যেকের মুখেই শুনেছি কেবল আশার বাণী। সবাই ইহুদী-খৃষ্টান-নাস্তিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সচেতন।

মসজিদে নববীতে দেখা পেয়েছি আলজিরিয়া থেকে আগত বিপ্লবী তিন যুবকের। মিনা যাওয়ার পথে জিএমসি'র জীপে বসে কথা বলেছি চীনের দুই বুড়োর সাথে। ভাঙ্গা আরবী ও ইশারা-ইঙ্গিতে ওরা মনের কথা বলার চেষ্টা করলেও হৃদয়ের টানে আমি তাদের গভীর অভিব্যক্তিটুকু বুঝে নিয়েছি পুরোপুরি। বাদশাহ আবদুল আযীয এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে জায়নামায বিছিয়ে বসে অনেক কথা হয়েছে লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও মারাকেশের হাজীদের সাথে। ডিউটি ফ্রি শপের সামনে পরম ঘনিষ্ঠতায় আপ্লুত হয়েছি মরক্কোর সেনা অফিসার বু-গালিব সনৌসি ও তার গোটা পরিবারের সপ্রতিভ আচরণে। এরা সবাই শুধু বলেছেন ইসলামী পুনর্জাগরণের ভবিষ্যত নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিস্ময়কর পরিবর্তন আর নতুন ক্রুসেডের ঘনঘটা নিয়ে। আলজিরিয়া, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, বার্মা, ফিলিপাইন ও বসনিয়া নিয়ে। পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারার মসজিদে নববীতে তো নিয়মিতই এবার কুনূতে নাযেলা পড়া হয়েছে হজ্বের মওসুমে। ইমাম সাহেবরা বসনিয়া-হারজেগোভিনার কথা বলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন আর গোটা বিশ্বের হাজী সাহেবান দিল খুলে 'আমীন-আমীন' বলতেন। ইসলামী জিহাদের শিক্ষা ও চেতনা যেন গোটা দুনিয়ার উম্মতে মুহাম্মদীকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যে ঘোরার সুযোগ হয়েছিলো ১৯৯২-এর মধ্যভাগে। দুবাই, আবুধাবী, শারজাহ্ আও আজমানেও শুনেছি একই ধরনের চেতনার প্রতিধ্বনি। বিশ্ব জুড়ে তাগুতী শক্তিসমূহের পতন ও ইসলামের ভিত্তিতে সংঘটিত নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি। সবার চোখে-মুখে দেখেছি নবজাগৃতির দৃঢ় সম্মতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পরই ঢাকার একটি পত্রিকায় আমার লেখা নিম্নোক্ত সম্পাদকীয়টি ছাপা হয়। পাঠকের জন্যে এতে রয়েছে চিন্তার অনেক সূত্র।

পয়গামে মুহাম্মদীর অবমাননা বনাম পতিত পরাশক্তি

গর্ব-অহংকার আর প্রতাপের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়ার ইতিহাস বড়ই প্রাচীন। মানবতার সমাধি ক্ষেত্রের উপর নির্মিত হঠকারিতা ও জবরদস্তির স্বর্ণসৌধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে ধুলায় মিশে যাওয়ার কাহিনীও খুবই পুরনো আর স্বাভাবিক।

১৯৯১ সালের শেষ দিনসমূহে অন্তিম নিঃশ্বাসগুলো ত্যাগ করে, এখন সম্পূর্ণ নিথর হয়ে গেছে নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পীঠস্থান, তথাকথিত

সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্য। এশিয়া ও ইউরোপের নানা জাতির মুক্ত আবাসভূমি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে ১৯১৭ সালে দখল করে গড়ে তোলা সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন একটি ব্যর্থতার নাম। সমাজতন্ত্র এখন একটি জাজ্বল্যমান গ্লানির দুঃস্বপ্ন।

নাস্তিক্যবাদের ধ্বংসাবশেষে এখন বহুসংখ্যক মুসলিম দেশের বীজ অংকুরিত হয়েছে। চোখ মেলে চাইছে নতুন স্বাধীন মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো। চেচিনো ইঙ্গুইশতোতে এখন না'রায়ে তাকবীরের আওয়াজ শোনা যায়। আজারবাইজানে এখন ধ্বনিত হয় ঈমানদীপ্ত অনেক পূর্ব নিষিদ্ধ শ্লোগান।

কয়েকদিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই বহুল ব্যবহৃত কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা রক্তবরণ পতাকাটি পরিবর্তন করে ব্যর্থতা ও ভাঙ্গনের চিহ্ন হিসেবে নয়া পতাকা উড়ানো হয়েছে। বদলানো হয়েছে নাম-ঠিকানা ও পরিচয়। এসবই অভাবনীয় দ্রুততা ও অকল্পনীয় নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে ঘটে গেলো।

আগেই বলেছি, এ ঘটনা নতুন নয়। গর্ব-অহংকার আর প্রতাপের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার ইতিহাস অতি পুরাতন। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন তদানীন্তন বিশ্বের বরেণ্য রাষ্ট্রপ্রধান ও সম্রাটদের প্রতি। অনেকের মতো সেদিন অন্যতম পরাশক্তি পারস্যের সম্রাট খসরুও পেয়েছিলো সেই পত্র, কিন্তু রাসূলের দাওয়াত গ্রহণ, বর্জন বা বিবেচনা ইত্যাদি কিছুই না করে সে করেছিলো বেআদবী। চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিলো পারস্য সম্রাট সরওয়ারে কায়েনাতের পত্রের প্রতি।

আল্লাহর রাসূল খবর পেয়ে বলেছিলেন, কিস্‌রা আমার পয়গামটিকে যেভাবে টুকরো করেছে, তার সাম্রাজ্যটুকুও এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ব্যস, আল্লাহর প্রিয়তম নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো।

চলতি শতকের অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্মাতারা রাসূলুল্লাহর পত্রও পায়নি আর একে ছিঁড়ে টুকরো টুকরোও করেনি। তবে তারা লাল বিপ্লবের সময় বা এর আগে-পরে উম্মতে মুহাম্মদীকে অনেক কাঁদিয়েছে। রক্ত ঝরিয়েছে বহু নিরপরাধ বনী আদমের। আর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে আল্লাহর কিতাবের প্রতি। বেআদবী করেছে পয়গামে মুহাম্মদীর সাথে।

বিশেষতঃ আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন ছিলো সমাজতান্ত্রিক সীমালংঘনের চরম পরাকাষ্ঠা। রাতের অন্ধকারে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে সেনা অভিযান চালিয়ে পনের লক্ষ মানুষকে হত্যা করা মসজিদ, মাদ্রাসা ও কুরআন শরীফের সীমাহীন অবমাননার সামান্য একটু পরিণতি হিসেবেও সোভিয়েত রাশিয়ার এই পতনকে ধরে নেয়া যায়। এরাও আল্লাহর রাসূলের কল্যাণ-পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে। নানাভাবে নানা সময়ে।

কাবুলের দ্বারপ্রান্তে জিহাদী কাফেলা

সাঁড়াশির মতো চারদিক থেকে এঁটে আসছিলো মুজাহিদদের আক্রমণ-ব্যূহ। কাবুলের উপকণ্ঠে এখন কেবল মুজাহিদদের মর্টার আর রকেট লাঞ্চারের আগুন। জালালাবাদের অস্ত্রনগরী আর বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র এখন হিযবে ইসলামীর হাতে। কাবুলের সামরিক বিমানঘাঁটিতে একের পর এক হামলা চলছে। বিমানবন্দরের একপাশে সমবেত হয়েছেন বেশ কিছু জানবাজ মুজাহিদ। সাত দলীয় জোট নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই পাকিস্তানের মুজাহিদ নগরী পেশোয়ারে। ক'জন পাক-আফগান সীমান্তবর্তী ক্যান্টনমেন্টে। হিযবে ইসলামী নেতা হিকমতইয়ার তখন কাবুলের দিকে ঝড়ের বেগে সৈন্য পরিচালনা করছেন। শয়তানীর শেষ আড্ডা কাবুলের হৃৎপিণ্ডে যখন মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত গোলা পতিত হয়, তখন জেনারেল নজীবুল্লাহের বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে। আফগান জাতির গাদ্দার এই কমিউনিস্ট ছিলো সরকারী পেটোয়া বাহিনীর প্রধান। শেষে সোভিয়েত সরকার তাকেই নিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট পদে। এই কুলাঙ্গার নাস্তিক "আল্লাহ" শব্দের সাথে তার নামের সম্পর্ক ছিন্ন করে নাম রেখেছিলো শুধু 'নজীব'। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর তার মন অমনিতেই ভেঙ্গে গিয়েছিলো। এরপর যখন গোটা আফগানিস্তান মুজাহিদদের পদানত এবং গ্যারিসন শহর জালালাবাদ হাতছাড়া হয়ে গেলো, তখন তার দেহ-মন সবই নিস্তেজ হয়ে এলো। কাবুলের দুয়ারে স্বাধীনতার সৈনিক আফগান জনতার পদচারণা শুনে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। ক'মাস আগেই অবশ্য সে তার বউ-ঝিকে ইউরোপ পাচার করে দিয়েছিলো। একে একে তার ঘনিষ্ঠ জেনারেলরাও চিকিৎসা, পর্যটন ও হাওয়া বদলের বাহানায় ইতালী, জার্মানী ও আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিলো। সময় শেষ হয়ে এসেছে বলে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাস্তিক প্রফেসর, আফগানিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও

সাংবাদিকতার অঙ্গনে ঘাপটি মেরে থাকা খোদাদ্রোহী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কাবুল ছেড়ে অন্যান্য দেশে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য নজীবুল্লাহর! সে সময় থাকতে পালাতে পারলো না। যখন পালানোর চেষ্টা করলো তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

কমিউনিস্ট জেনারেলের সপক্ষ ত্যাগ

কাবুলের উপকণ্ঠে আফগান মুজাহিদদের হায়দরী হাঁক শোনা যায়। কাবুলের নাস্তিক্যবাদী গণদুশমন সরকারের সামনে ঘোর অন্ধকার। মাত্র সাত দিনের ভেতর ক্ষমতা হস্তান্তর ও সামরিক-বেসামরিক সকল কমিউনিস্টদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন গুলবদন হিকমতইয়ার। এক সপ্তাহের মধ্যে এ পথ অবলম্বন না করলে চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করা হবে কাবুলের উপর। রাজধানী থেকে বার কিলোমিটার দূরে এক পাহাড়ী উপত্যকায় একটি সামরিক হেলিকপ্টার এসে নামলো। লাফিয়ে নেমে আসা দু'জন কমিউনিস্ট সৈন্যের হাতে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক সাদা পতাকা। ওয়াকিটকিতে তারা একজন মুজাহিদকে আহ্বান জানালো। এগিয়ে গেলেন একজন। হেলিকপ্টারে বসে রয়েছেন কাবুল সরকারী বাহিনীর উপ-প্রধান জেনারেল রফী। তিনি আফগান জনতার সাথে বেঈমানীর জন্যে চরম অনুতপ্ত। ক্ষমা চাইতে এসেছেন মুজাহিদদের নিকট। তিনি তার বিপুলসংখ্যক সমর্থক নিয়ে মুজাহিদদের দলে যোগ দেবেন। কাবুল বিজয়ের পরিকল্পনায় তিনি হিকমতইয়ারকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের ওয়াদাও দেন। মুজাহিদদের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বললেন দুই সেনানায়ক মুজাহিদ নেতা হিকমতইয়ার ও সদ্য তওবাকারী কমিউনিস্ট আফগান জেনারেল। হিকমতইয়ার তাকে স্বাগত জানিয়ে বলে দিলেনঃ বড্ড দেরী হয়ে গেলো আপনাদের বোধোদয় হতে। ঠিক আছে, মোবারকবাদ আপনার এই পরিবর্তনকে। আমরা সাত দিন সময় দিয়েছি। তাই সাত দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সৈন্যাভিযান চালানো ঠিক হবে না। উড়ে গেলো জেনারেল রফীর হেলিকপ্টারটি কাবুলের দিকে। জিহাদী শার্দূলদের হাতে পার্বত্য ঝোপ-ঝাড়ে তৈরি ডেরায় ফিরে এলেন ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন।

আমাদের ফেলে রেখে যাবে কই সোনা?

সেনাবাহিনীর ভেতর দেশপ্রেম ও ঈমানী চেতনার লক্ষণ দেখে কমিউনিস্টদের দল ত্যাগের হিড়িক আর মুজাহিদদের অব্যাহত ভীতি প্রদর্শনে মাথা খারাপ হয়ে গেলো নজীবুল্লাহর। স্পেশাল বিমানে চড়ে একলাফে সে চলে আসতে চাইলো দিল্লী। সোভিয়েত রাশিয়াই একসময় ছিল তার মতো কমিউনিস্টদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখন একমাত্র হিন্দু-ভারত ছাড়া তার আর কোনই আশ্রয় নেই। বেতার মারফত খবর পেয়ে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে লাগলো ভারতীয় কর্মকর্তারা। ইসলাম ও মুসলমানের জঘন্যতম দুশমন নজীবুল্লাহকে জামাই আদরে রাখা হবে দিল্লীর কোন অতিথিশালায়, কিন্তু বিধিবাম। প্রাসাদরক্ষীদের হাতেই ধরা পড়লো নজীবুল্লাহ। পালিয়ে যেতে উদ্যত এ বীরপুঙ্গবকে তার সান্ত্রীরা একচোট প্যাঁদানী দিয়ে গাড়ীতে উঠালো। বললো, এতোদিন দেশ, জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের খেলিয়ে কোথায় পালাচ্ছেন, আমাদের কোথায় রেখে যাচ্ছেন আপনি? এ সময় আমেরিকার গৃহপালিত পঞ্চায়েত জাতিসংঘে'র দূত সেভান ওয়াশিংটনের নির্দেশে জেনারেল নজীবুল্লাহকে কাবুলস্থ জাতিসংঘ দফতরে আশ্রয় দিয়ে প্রাণে রক্ষা করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট। ছিঁচকে ইঁদুরের মতো জাতিসংঘ অফিসে সময় কাটাতে থাকে এককালের মহাত্রাস, নিষ্ঠুর শাসক জেনারেল নজীব।

প্রেসিডেন্টের পলায়ন, সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা ও মুজাহিদদের আক্রমণ প্রস্তুতির সংবাদ গোটা বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কমিউনিস্ট শ্রেণী মর্মাহত, উদ্বিগ্ন ইহুদী-খৃষ্টান চক্র। সীমাহীন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হিন্দু ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী। আর বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহর মনে আশা-নিরাশার চরম দোলা। বিজয়ের আনন্দ আর আসন্ন যুদ্ধাভিযানে ক্ষয়ক্ষতির আশংকায় দুরুদুরু বক্ষ ঈমানদার শ্রেণী দোআ আর ঐকান্তিক মোনাজাতের পথই বেছে নিলেন। রাবাত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহানে কেবল একই আলোচনা। কাবুল। মুজাহিদ। বিজয়।

শেষ মুহূর্তে শয়তান সক্রিয়

কাবুলের চারপাশ ঘিরে মুজাহিদরা সাতটি দিন পার হওয়ার অপেক্ষায় অধীর। নির্ধারিত মেয়াদের আগেই হয়তো কাবুল বাহিনী আত্মসমর্পণের জন্যে তাদের

কাছে খবর পাঠাবে। ক্ষমতা বুঝে নেবেন অগ্রবর্তী মুজাহিদ নেতারা। প্রত্যক্ষ লড়াই আর ময়দানী তৎপরতার প্রবাদপুরুষ হিকমতইয়ার হবেন বিপ্লবী মুজাহিদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী আর জমিয়তে ইসলামীর বোরহানুদ্দীন রাব্বানী হবেন প্রেসিডেন্ট। আফগানিস্তান হবে পৃথিবীর একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র। যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র–কারো কথা চলবে না। ভারত, চীন, ফ্রান্স, ইতালী বা জাপানের শক্তি-সামর্থ্যকেও যে দেশটি বিন্দুমাত্র কেয়ার করবে না। গোটা পৃথিবীতে মুসলিম জাতির মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আল্লাহর দ্বীনের আওয়াজকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রতিটি দিগন্তে বুলন্দ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি ইসলামী সরকার কাবুল শাসন করবে।

না, এমনটি হতে দেয়া যায় না। ইহুদী-খৃষ্টান মোনাফেকচক্র সক্রিয় হয়ে উঠলো। তৎপর হয়ে উঠলো পরাশক্তির মোড়ল পরিষদ জাতিসংঘ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ (অর্ধেক পৃথিবীর নিয়ন্তা। যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর বড়সড় একটা ফেরাউন হয়ে গেছেন)-এর স্মৃতিতে ভেসে উঠলো ইঞ্জিনিয়ার হিকমতইয়ারের চরম অবজ্ঞার ঘটনা। কন্যাকে পাঠিয়েও যে যুবকটিকে হোয়াইট হাউসে ডেকে আনতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই হিকমতইয়ারের হাতে কাবুল তুলে দিয়ে তিনি কি তার মরণ ডেকে আনবেন? গোটা পাশ্চাত্য বিশ্বের চাপ ও দিল্লীর করুণ কাকুতি উপেক্ষা করতে না পেরে অবশেষে পাকিস্তান ও সউদী আরবের মার্কিন তাবেদার গোষ্ঠীটিকে ব্যবহার করলেন তিনি। চরমপন্থী হিকমতইয়ারকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থানকারী মধ্যপন্থী মুজাহিদ নেতাদের সামনে রেখে বহুদলীয় নাগরিকদের সমন্বয়ে তৈরি একটি পরিষদের হাতে কাবুলের পতিত সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। জাতিসংঘে নিযুক্ত সউদী দূত ও পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কাবুলে ছুটে এলেন। জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালি এলেন ভারতে–পরামর্শ নিয়ে পৌঁছলেন পেশোয়ারে। বেনন সেভান তো কাবুলেই ছিলেন। কূট-কৌশল আর সীমাহীন জটিলতার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের সহজ-সরল ব্যাপারটিকে করে ফেলা হলো কঠিন, সংশয়পূর্ণ। মুজাহিদদের স্বাভাবিক ও সম্মানপূর্ণ বিজয় হলো বিঘ্নিত।

স্বাধীন আফগানিস্তানে বিজয়ী মুজাহিদদের ক্ষমতা গ্রহণ-মুক্ত কাবুল

২৫শে এপ্রিল ১৯৯২ আফগান মুজাহিদরা দেশের ক্ষমতা লাভ করলেন। স্বাধীন আফগানিস্তান শত্রুমুক্ত হলো। বিজয় সূচিত হলো দীর্ঘ চৌদ্দ বছরব্যাপী জিহাদ পরিচালনাকারী তাওহীদী জনতার। নজীবুল্লাহর প্রাসাদে বীরদর্পে প্রবেশ করলেন মুজাহিদরা। এ সময় কমিউনিস্ট সেনারা মুজাহিদদের উপর চোরাগুপ্তা হামলাও করলো। আর পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো একে মুজাহিদদের অর্ন্তদ্বন্দ্ব বলে প্রচার করলো। বলা হলো যে, মাসউদ ও হিকমতইয়ার বাহিনীর পরস্পর সংঘর্ষে কাবুলে যে সন্ত্রাস ও ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে, তা বিগত চৌদ্দ বছরের যুদ্ধেও হয়নি। কাবুলে বহুসংখ্যক মুসলমানের প্রাণহানি ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত মোজাদ্দেদীর নেতৃত্বে একটি ইসলামী কাউন্সিল ক্ষমতা বুঝে নিলেন। শুরু হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনগঠনের আন্দোলন। মদ-জুয়া নিষিদ্ধ হলো। ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ঢেলে সাজানো শুরু হলো। মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হলো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন পানশিরের সিংহ ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্ মাসউদ। তিন দফা দাবী পেশ করে কাবুল ছেড়ে চলে গেলেন হিকমতইয়ার। তিনি চান, অবিলম্বে কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের অপসারণ। মার্কিনী প্রভাবমুক্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সরকার। সাধারণ নির্বাচন।

মূলতঃ এ ব্যাপারটি ছিলো দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। অথচ পশ্চিমা গোষ্ঠী একে ক্ষমতার লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করে মুসলিম-বিশ্বে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার অপপ্রয়াস চালাতে থাকে। এমনি মুহূর্তে হিকমতইয়ার জালালাবাদে তাঁর প্রধান ঘাঁটির নিকটস্থ এক পর্বতের পাদদেশে মুজাহিদ বেষ্টিত অবস্থায় পশ্চিমা মিডিয়াগুলোর সাথে দশ মিনিট কথা বলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন যে, কাবুল মুক্ত হয়েছে। স্বাধীন আফগানিস্তানে শুধু আর শুধু ইসলামই থাকবে। মুজাহিদদের যে পরিষদ ক্ষমতায় গিয়েছে তাদের সাথে আমার মৌলিক কোন বিরোধ নেই। তবে সাবেক কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে বের না করে দেয়া পর্যন্ত আমি জিহাদ চালিয়েই যাবো। মার্কিনীদের বিন্দুমাত্র মুরুব্বীয়ানাও এ দেশে আমি হতে দেবো না। পাশাপাশি পাকিস্তান, ইরান ও সউদী আরবকেও আমি বলছি, তারা যেন আফগানিস্তানের নীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ না

করে। আফগানিস্তান অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো একটা দেশ মাত্র নয়। এ হলো গোটা মুসলিম বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। একটি কথা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, দুনিয়ার কোন শয়তান যেন আফগান মুজাহিদদের পরস্পরের শত্রু মনে করে ভুল না করে। আমাদের মত বিভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক অভিন্ন।

ঠিক এ মুহূর্তে আফগান মুজাহিদদের পরম বন্ধু পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশি। এই শহীদ মুজাহিদের অবর্তমানে পাকিস্তানের কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম আহমদ শাহ্ মাসউদ আর গুলবদন হিকমত ইয়ারের মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। এতে আহমদ শাহ বলেনঃ আমার কোন লোক কখনো আপনার বাহিনীর উপর গুলি ছোঁড়েনি, ছুঁড়তে পারে না। এ ছিলো স্বাধীন কাবুলে ঘাপটি মেরে থাকা কমিউনিস্টদের কাণ্ড। হিকমতইয়ারও তাঁর দাবীগুলো নতুন সরকারকে পৌঁছে দিলেন এ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। আফগান জিহাদে মুজাহিদদের প্রকাশ্য বিজয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া, সমাজতন্ত্রের পতন, কাবুল শত্রুমুক্ত হওয়া ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ইত্যাদি সবকিছুর কথা বাদ দিয়ে কাবুলে ক্ষমতার লড়াই আখ্যায়িত করে গোটা মুসলিম উম্মাহকে হতাশার আঁধারে নিমজ্জিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো বিশ্বের সকল শয়তান। ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি আর সর্বনাশ করাই যাদের সম্মিলিত কর্মসূচী। আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী মুজাহিদদের মুখপত্র মাসিক "জাগো মুজাহিদে" এ সময়টিতেই প্রকাশিত হলো নিম্নলিখিত সম্পাদকীয়।

বিজয়ী আফগান মুজাহিদ ও মুক্ত আফগানিস্তানঃ মুসলিম উম্মাহর নতুন আশার দীপ্তশিখা

ইসলাম ও মুসলমানের দেশ আফগানিস্তান। চির স্বাধীন ও সংগ্রামী জাতি আফগান। পার্শ্ববর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয় দীর্ঘদিন আগে। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মাধ্যমে সোভিয়েত কমিউনিস্টরা এই দেশটিতে তাদের শিকড় গেড়ে দেয়ার প্রয়াস পায়। আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান ও স্বকীয়তার রক্ষাকবচ ছিলো ইসলাম। এই ইসলাম ও ইসলামপ্রিয় মানুষকে নানা প্রক্রিয়ায় কোণঠাসা করে

নাস্তিক্যবাদী সোভিয়েতরা এ দেশে তাদের বিপুলসংখ্যক দালাল সৃষ্টি করে। কবি, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নাট্যকার, লেখক ও ছাত্র-তরুণদের একটা বিরাট গ্রুপ তারা কিনে নেয় টাকা, পয়সা, চাকুরী, মদ-নারী ও গাড়ী-বাড়ী দিয়ে। এসব গোলামী মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের তারা কমিউনিজম ও নাস্তিকতা প্রচারে নিয়োগ করে। সেনাবাহিনীর ভেতরও ওরা টোপ ফেলে। সোভিয়েত উপদেষ্টারা আফগান সেনাবাহিনীকে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তুলনামূলক বেশি তাঁবেদার ও অধিক পা-চাটা গোলামদের মস্কো সফর করানো হয়। সেখানে নানা ধরনের হারাম সম্ভোগের আয়োজন করে এদের মগজ ধোলাই করা হয়। নৃত্যপটীয়সী, গায়িকা , অভিজাত দেহ-ব্যবসায়ীদের আফগানিস্তানে পাঠিয়ে যুব সমাজের মাথা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এসব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর শুরু হয় ষড়যন্ত্র। একের পর এক সরকার পরিবর্তন হতে থাকে। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট শাসক ক্ষমতায় আসে। মুসলিম জনতার উপর শুরু হয় নিপীড়ন।

১৯৭৯ সালে সরাসরি সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। রাতের অন্ধকারে দেশটি দখল করে নেয় ওরা। ক্ষমতাসীন সরকার ও বিদেশী শত্রুরা চলে যাওয়ার পর সুদীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে মুজাহিদ অভিযান। গোটা আফগান ভূমি মুক্ত হলেও রাজধানী কাবুল ও এর উপকণ্ঠে নাস্তিক সরকার তার অবশিষ্ট শক্তি সমবেত করে টিকে থাকে। মুজাহিদদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানে কাবুলের দুর্লংঘ ব্যূহও আজ ধসে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট নজীবুল্লাহ্ আটকা পড়েছে।

ইতোমধ্যে সর্বদলীয় মুজাহিদ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৫০ সদস্যের একটি কাউন্সিলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে কাবুলের কমিউনিস্ট সরকার সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। প্রেসিডেন্ট নজীব কাবুল জাতিসংঘ দফতরে আশ্রয় নেয়। সারা বিশ্বের কোন দেশই যখন এ নরাধম কমিউনিস্টকে আশ্রয় দেয়ার (শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও) সাহস পাচ্ছিলো না, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত নজীবুল্লাহকে 'জামাই আদরে' ভারতে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নেয়। তার পরিবারবর্গ কাবুলের পতনের আগেই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো। তবে মুজাহিদদের আক্রমণের ভয়ে জাতিসংঘের বিমানটি নজীবুল্লাহকে নিয়ে কাবুলের আকাশে ডানা মেলার সাহস পায়নি। সে এখনো কাবুলেই আত্মগোপন করে আছে।

যথাসময় মুজাহিদ কাউন্সিল কাবুলে পৌঁছে ক্ষমতা হাতে নেয়। পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে ৫০০ গাড়ীর বহর নিয়ে স্বাধীন আফগানিস্তানের মুক্ত রাজধানী কাবুলে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন মুজাহিদ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী। তিনি তাঁর প্রথম ভাষণে সাবেক প্রেসিডেন্ট নজীবুল্লাহ ব্যতীত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, সরকারী কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। মুজাহিদদের প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। এ ঘটনা ২৫শে এপ্রিলের।

২/৪ দিন পর মুজাহিদ বাহিনীর অন্যতম প্রধান ফিল্ড কমান্ডার আহমদ শাহ্ মাসউদ শত শত ট্যাঙ্কের বহর নিয়ে কাবুলে প্রবেশ করেন। কাবুলের নিরাপত্তা ও গোটা আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা এখন তাঁরই দায়িত্বে।

বিজয়ের পর পরই পাকিস্তান, সউদী আরব ও ইরান আফগানিস্তানের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর রাশিয়াও স্বীকার করে নেয় নতুন মুজাহিদ সরকারকে। বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে দেরী করছে। কেন, জানা নেই। হয়তো বিদেশ থেকে কোন উপদেশকের বাণীর অপেক্ষা অথবা অন্য কিছু। বাংলাদেশী মুজাহিদ সংগঠন "হারকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর" নেতৃবৃন্দ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে আফগানিস্তানের মুজাহিদ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানান। এছাড়া তাঁরা আফগান জিহাদে শাহাদাতবরণকারী ২৪ জন বাংলাদেশী মুজাহিদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শনেও দাবী সরকারের নিকট পেশ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, কাবুলের কমিউনিস্ট সরকারের পরাজয় যাদের হাতে হয়েছে, সে হাতগুলোকে কে না ভয় পায়? আমেরিকাও খুব ভালোভাবেই জানে যে, তার ঘরে আগুন লাগানোর মতো একটি শক্তিই এই ধরাপৃষ্ঠে রয়েছে–আর সেটি হলো আফগানিস্তানের মুজাহিদ বাহিনী। বিশ্ব ইহুদী, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ও বৌদ্ধ সবাই এই নতুন মহাশক্তিকে ভয় করে। তাই মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য, হানাহানি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অযোগ্যতা ইত্যাদি প্রচার করা হচ্ছে খুব জোরেসোরে। খৃষ্টান জগতের Voice of america ও B. B. C. হিন্দুদের ALL INDIA RADIO ও আকাশবাণী এবং ইহুদী চক্রের রয়টার, এপি,

এ. এফ. পি, C. N. N. টলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর পৃথিবীর (মুসলিম-অমুসলিম) জনগণ পড়ে, দেখে ও শোনে। আর মনে করে যে, আসলেই বোধহয় মুজাহিদরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। মূলতঃ এসবই পরাজিত অমুসলিম বিশ্বশক্তির 'সম্প্রচার যুদ্ধ।' সম্মুখসময়ে পরাজিত সৈন্যদের এই "কৌশলগত লড়াই" এখন পুরোদমে চলছে। ১৪ বছরের যুদ্ধশেষে বিজয়ী জনতা হাজার হাজার ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে কাবুলের আকাশ যখন আলোকিত করে ফেলছিলো তখন পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো সেটাকে মুজাহিদদের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ বলে বগলবাদ্য শুরু করে বিজয়কে নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। যা শুনে অনেক দ্বীনদার মুসলমানকেই উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে।

মূলতঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে একটি মুজাহিদ গ্রুপের ভিন্নমত পোষণ একান্তই সাধারণ ও স্বাভাবিক একটি ঘটনা।

কিন্তু মুজাহিদদের মহান বিজয় আজ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল সত্য। চামচিকাগুলো চোখ বুঁজে থাকলেও সূর্য মধ্যগগনে উত্তাপ ও আলোকরশ্মি বিকিরণ করবেই। স্বাধীন আফগান-ভূমি আজ পূর্ণিমা চাঁদের মতো মিষ্টি জ্যোৎস্নায় গোটা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের হৃদয়ের আকাশ প্লাবিত করবেই। হিংসুটে প্রাণীগুলো এতে যতোই ক্ষিপ্ত হোক–এসব সারমেয়-এর ঘেউঘেউ জিহাদের গগনবিদারী আওয়াজে মিলিয়ে যাবে।

আফগান মুজাহিদদের সাফল্য গোটা বিশ্ব-মুসলিমের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা, মুক্তি ও কল্যাণের বার্তা বয়ে আনুক। বিজয়ের এই শুভলগ্নে এটাই আমাদের কামনা।

আলহামদুলিল্লাহ

২৫শে এপ্রিল ১৯৯২ মহান বিজয় দিবস। কাবুল মুক্ত। কায়েম হয়েছে মুজাহিদ সরকার। ইসলামী শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সকল স্তরের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন। শরণার্থী আফগানরা ফিরে আসছেন স্বদেশের মাটিতে। রাশিয়ান যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা চলছে। আফগান প্রেসিডেন্ট সফর করছেন বিভিন্ন দেশ। বিভিন্ন প্রদেশে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিগুলো আদালত কর্তৃক কার্যকর করা হচ্ছে। দেশে ফিরে এসেছে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুস্থ পরিবেশ। এখন প্রয়োজন সুন্দর

পরিকল্পনা। দেশ গঠন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সম্মিলিত প্রয়াস। চৌদ্দ বছরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ী-ঘর, রাস্তাঘাট, সামরিক-বেসামরিক স্থাপনা ইত্যাদি পুনর্নির্মাণ। কাজ এগিয়ে চলেছে।

এ গেলো আফগানিস্তানের কথা। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় মধ্য-এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীনতা ফিরে পেলো। "দীর্ঘ সত্তর বছর পরে গোলামীর জিঞ্জির মুক্ত হলো আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজিয়া, তুর্কমেনিস্তান।" এগুলোও আফগান জিহাদেরই ফসল।

বিজয়ের আনন্দঃ দেশে বিদেশে

আফগানিস্তানের রাজধানীতে মুজাহিদদের পদার্পণ ও কাবুল মুক্ত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা বিশ্ব-মুসলিমের মনে পরম আনন্দ ও স্বস্তি ছড়ি পড়ে। বিশেষ করে ভারতীয় কাশ্মীরের প্রতিটি শহরে বের হয় আনন্দ মিছিল। বিপুলসংখ্যক ফাঁকা গুলি আর বোমা ছুঁড়ে হর্ষোৎফুল্ল জনতা স্বাগত জানায় আফগান বিজয়কে। ঢাকায়ও বের হয় স্বতঃস্ফূর্ত বিজয় মিছিল।

২৫শে এপ্রিল ৯২ এশার নামাযের পর তাওহীদী জনতা নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার, মুজাহিদীনে আফগান-জিন্দাবাদ, রুশ-ভারত-মার্কিন/ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন--ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এর পরবর্তী জুমার দিন আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী মুজাহিদদের আহ্বানে হারকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ, বিজয় ও শুকরিয়া মিছিল। বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেইট থেকে লক্ষ জনতার বিপ্লবী পদযাত্রা শুরু হয়ে প্রেসক্লাবে গিয়ে সমাপ্ত হয়। নেতৃবৃন্দ আকাশ কাঁপানো কণ্ঠে মার্কসবাদের মৃত্যু ও সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার ঘোষণা দেন। উচ্চারিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর কমিউনিজমের ধ্বংসবার্তা। আফগানিস্তানের জিহাদী জযবা ও স্বাধীনতার দীপ্ত চেতনার আদর্শ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে মুজাহিদরা উপস্থিত সমাবেশকে উদ্দীপিত করেন। দল-মত নির্বিশেষে সকল স্তরের মুসলমান এতে শরীক হয়।

ঢাকায় মুজাহিদদের সংবাদ সম্মেলন

পরবর্তী সপ্তাহে ৩০শে এপ্রিল ১৯৯২ জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশী মুজাহিদরা এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে হারকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সংগ্রামী আলেমরা অংশ নেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সর্বপ্রথমে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। আজ আমরা সীমাহীন আনন্দচিত্তে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আফগানিস্তানের মতো ক্ষুদ্র ও দুর্বল একটি দেশকে স্বাধীনতা দান করেছেন। সহায়-সম্বলহীন নিরস্ত্র আফগান জনতাকে কাবুলের নিয়মিত সরকারী সশস্ত্র বাহিনী ও দখলদার সোভিয়েত সৈন্যদের উপর বিজয়ী করেছেন। আধিপত্যবাদের ভয়াল থাবায় বিপর্যস্ত আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে সম্প্রসারণবাদী সমাজতান্ত্রিক অপশক্তির কবর রচনা করেছেন। সেই মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি আমরা আজ পরম কৃতজ্ঞ, যাঁর অপার মহিমায় বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের সমাধি রচিত হয়েছে। কল্পনাতীত স্বল্প সময়ের ভেতর বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আল্লাহর অসীম রহমতে আফগান-ভূমি আজ মুক্ত। কাবুলে এখন ইসলামী পতাকা উড়ছে।

ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে যে, দীর্ঘ ১৪ বছর সশস্ত্র লড়াইয়ের পর অতি সম্প্রতি আফগান মুজাহিদরা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজাহিদ নেতা জনাব সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদীর নেতৃত্বে আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা হাতে নিচ্ছেন। জনাব মোজাদ্দেদী আফগানিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমরা আশা করি আফগানিস্তানের নবগঠিত ইসলামী সরকার অচিরেই পূর্ণ শক্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশটিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা

আফগানিস্তানের এই বিজয় মূলত আধিপত্যবাদী পরাশক্তির বিরুদ্ধে নিরীহ মযলুমের বিজয়। নাস্তিক্যবাদী খোদাদ্রোহী অপশক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহওয়ালা ও খোদাভীরু জনতার বিজয়। এ বিজয় শুধু আফগান মুজাহিদ বা জনগণেরই নয়; বরং বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের বিজয়। এ বিজয়ের মাধ্যমে যেমন একটি পরাশক্তির প্রত্যক্ষ ও অন্য সকল ইসলামবিরোধী চক্রের পরোক্ষ পরাজয় সংঘটিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণেরও হয়েছে শুভ উদ্বোধন। ইসলামী বিজয় যুগের স্বর্ণালী সূচনা। আফগানিস্তানের মতো শান্ত ও নিরব-নিরীহ একটি দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী সোভিয়েত রাশিয়ার ষড়যন্ত্র ছিলো বহু দিনের। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বহুমুখী চক্রান্ত করে সব শেষে দেশীয় কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় ও স্বদেশের বিভিন্ন অঙ্গনে ঘাপটি মেরে থাকা জাতীয় গাদ্দার এবং বিদেশী দালালদের আমন্ত্রণে ১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের কালো রাতে সোভিয়েত বাহিনী আফগান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে দেশটি দখল করে নেয়। ইতিহাসের নির্মমতম বর্বরতা ও অভূতপূর্ব পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নাস্তিক্যবাদী লাল সৈনিকেরা। স্বাধীনতাপ্রিয় আফগান জনসাধারণ ও দেশপ্রেমিক সংগঠনের কর্মীরা প্রতিরোধ লড়াইয়ে যোগ দেয়। শুরু হয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পরাশক্তি ও সেনাশক্তির বিরুদ্ধে নিরীহ জনতার অসম যুদ্ধ। ইসলামী জিহাদের অসাধারণ কার্যকারিতা, ঈমানী চেতনার অকল্পনীয় বিজয় ও সফলতা এসে ধরা দেয়। দীর্ঘ ১৪ বছরে শাহাদাতবরণ করতে হয় ২০ লক্ষ মানুষকে। ঘর-বাড়ী ছেড়ে ভিন্ দেশে হিজরত করতে বাধ্য হন ৬০ লক্ষাধিক মানুষ। বহু রক্ত আর সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে আসে কাঙ্ক্ষিত বিজয় ও বহুলকাম্য স্বাধীনতা।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

বিপদগ্রস্ত আফগান ভাইদের সাহায্যার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম ছাত্ররা আফগানিস্তানে এসে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলাদেশ থেকেও বিপুলসংখ্যক ইসলামপ্রিয় যুবক আফগান রণাঙ্গনে ছুটে যান এবং অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশী মুজাহিদরা সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক মুজাহিদ দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন।

আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও মুজাহিদদের ঐতিহাসিক বিজয়ে বাংলাদেশী দামাল মুজাহিদদের অবদান অসামান্য, যা আফগানিস্তানের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যে ইতিহাস বাংলাদেশী মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করবে। এ পর্যন্ত কয়েক হাজার বাংলাদেশী আফগান জিহাদে শরীক হয়েছেন। যেসব রণাঙ্গনে বাংলাদেশী মুজাহিদরা গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছেন, তন্মধ্যে উরগুন, গজনী, খোস্ত, গরদেজ, জালালাবাদ, পানশির, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাত উল্লেখযোগ্য।

রুশ দখলদারীর গোড়া থেকেই বাংলাদেশী যুবকরা বিক্ষিপ্তভাবে নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্ট সেনাদের সাথে শক্তি পরীক্ষা করলেও ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশী শহীদ কমান্ডার মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকীর নেতৃত্বে উরগুন সেক্টরে সংঘবদ্ধভাবে জিহাদে যোগ দেয়।

১৯৮৮ সালে উরগুন বিজয়ের পর বাংলাদেশী মুজাহিদরা অন্যান্য সেক্টরে ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়ের এই শুভলগ্নে প্রায় হাজারখানেক বাংলাদেশী আফগান ভূমিতে রয়েছে। কমান্ডার আবদুর রহমান ফারুকীসহ মোট ২৪ জন বাংলাদেশী মুজাহিদ রণাঙ্গনে শহীদ হয়েছেন। হাফেজ কামরুজ্জামান সর্বপ্রথম ও মুহাম্মদ আলী সর্বশেষ বাংলাদেশী শহীদ। ১০জন বাংলাদেশী চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। অসংখ্য মুজাহিদ পুনরায় কোন রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছেন।

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মযলুম মানবতার প্রতি সহজাত ঈমানী দায়িত্ববোধের দাবীতে সকল বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া মুজাহিদরা এখন রণক্লান্ত। তবে তাঁদের কাজের বিরাম নেই। যতোদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হতে থাকবে, যতোদিন নিষ্পেষিত হতে থাকবে মুসলিম জাতি, ততোদিন মুজাহিদরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না। বাংলাদেশী মুজাহিদরা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে দাঁড়াবে। হারকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম। বাংলাদেশে ইসলামী জিহাদের বাণী প্রচার ও জিহাদী কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির পরিচর্যা ছাড়াও

গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জিহাদের লুপ্তপ্রায় চেতনায় সকলকে করার মহান লক্ষ্যে এই সংগঠন দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে। কারণ, জিহাদই স্বাধীনতা, সুখ-সমৃদ্ধি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের একমাত্র গ্যারান্টি। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীকে শান্তি-সুখের নীড়ে পরিণত করতে হলে ইসলামী জিহাদ অপরিহার্য। মানবতার মুক্তির জন্যেও ইসলামের বিজয় অনিবার্য। আল্লাহর সাহায্য হলে এ বিজয় অত্যাসন্ন। খোদাহাফেজ।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

বর্তমানে স্বাধীন আফগানিস্তান ও মুক্ত কাবুল সম্পূর্ণভাবে মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীনতা ও বিজয়ের ব্যাপারে কোনরূপ সংশয় নেই আফগান জনতার মনে। ইহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দুদের প্রচার মাধ্যমে এবং মুসলমানের ঘরে জন্ম নেয়া সাম্রাজ্যবাদের গোলামদের পত্র-পত্রিকায় আফগানিস্তানে যে অশান্তি বা মুজাহিদদের অনৈক্যের যে সংবাদ প্রচার করা হয়, তা মূলতঃ মিথ্যাচার ও হলুদ সাংবাদিকতা। তবে স্বাধীন একটি রাষ্টে বিরোধী রাজনীতির অস্তিত্ব তো অবশ্যই আছে।

আল্লাহু আকবার খচিত পতাকা

আফগানিস্তানের পাহাড়ে, উপত্যকায়, মালভূমিতে সমতলে–সর্বত্র এখন সগৌরবে উড়ছে আল্লাহু আকবার এবং কালেমা শরীফ–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খচিত পতাকা কাস্তে-হাতুড়ী মার্কা পতাকার কাহিনী এখন অতীতের ঘৃণিত অধ্যায়। ঢাকাস্থ আফগান দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স গত ২২শে নভেম্বর ১৯৯২ ঢাকায় দৈনিক ইনকিলাবের কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে জানান যে, নতুন ইসলামী পতাকায় তিনটি রং-এর সমাহার ঘটেছে–কালো, সাদা এবং সবুজ।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আফগানিস্তানে জেনারেল নজীবুল্লাহর কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর ইসলামী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিউনিস্ট প্রশাসনের জের ও কর্তৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে বহাল থাকে। নজীবুল্লাহর পতনের পর ইসলামী বিপ্লবী সরকারের পক্ষ থেকে সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করলেও মুজাহিদ নেতা আহমদ শাহ্ মাসউদের বদৌলতে রশীদ দোস্তামের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট মিলিশিয়ারাও ক্ষমতার লড়াইয়ে শরীক হয়।

বিভিন্ন সূত্রে কাবুল থেকে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, মুজাহিদ নেতা গুলবুদ্দীন হিকমতইয়ারের হিযবে ইসলামীর সাথে প্রশাসনের গোলযোগ কমিউনিস্টপন্থী এই মিলিশিয়াদেরকে কেন্দ্র করেই সূচিত হয় এবং অনেক দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এক পর্যায়ে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়। জানা যায়, এ সময় কমিউনিস্টপন্থী মিলিশিয়ারা মর্টারের সাহায্যে আকাশে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে অংকন করতো হাতুড়ী-কাস্তে মার্কা কমিউনিস্ট পতাকা। সাথে সাথে ইসলামী মুজাহিদরা তার জবাব দিতেন আকাশে আলো খচিত ইসলামী পতাকার দ্যুতি ছড়িয়ে, এসবের অবসান ঘটিয়েছিলো ইসলামী বিপ্লবী সরকার। কমিউনিস্টদের প্রেতাত্মা চিরতরে বিতাড়িত করে বিপ্লবী সরকার ইসলামী পতাকা চূড়ান্তরূপে মনোনীত করেছেন। মুজাহিদরা ১৪ বছর ধরে যুদ্ধ করেছেন। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বিতাড়িত করেছেন। আজ নজীবুল্লাহ বিতাড়িত, বিতাড়িত তার বাহিনী। সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাঁরা ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছেন।

মুক্ত আফগানিস্তানে আজ বিজয় গৌরবে উড্ডীয়মান ইসলামের পতাকা, এই পতাকার হাওয়া মধ্য-এশিয়ার মুসলমানদের করছে উজ্জীবিত।

সুপ্রিয় পাঠক! ১৯৮৮ সালের আগস্টে যখন আমি প্রথম এ বইটি লিখি, তখন আফগান জিহাদ চলছিলো। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট তখন মাত্র তাদের ভুল স্বীকার করেছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া। এরপর আমার লেখার মতো অনেক বিষয় সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলো সংযোজন করার উদ্দেশেই পুনরায় ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বইটির বর্তমান সংস্করণ তৈরিতে হাত দিতে হলো। সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ, ডঃ আয্‌যাম, তামীম আল-আদনানী, শহীদ মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী ভাইসহ বাংলাদেশী আরও ২৩ জন মুজাহিদের শাহাদাত, আফগান জিহাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ও এর প্রতিবিধান ইত্যাদি। অবশেষে কাবুলের বিজয়। মুজাহিদদের ফাতহে মুবীন। আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার। এ সবই বর্তমান বইয়ে অতি সংক্ষেপে হলেও সন্নিবেশিত হয়েছে। ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

গত সংস্করণে বইয়ের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় "আমরা এখন কি করবো" শীর্ষক যে কথাগুলো লিখেছিলাম। এরই সংস্করণ। আমি সেদিন লিখেছিলাম, মুজাহিদীনে

আফগানের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে, মুসলিম উম্মাহর মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে, বাংলাদেশে ইসলামের বিজয়ের জন্যে দোআ ও সংগ্রাম করবো। আর আফগান জিহাদ পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখবো। একের পর এক ঘটনা ও বিজয় কাহিনীর জন্যে পত্র-পত্রিকা বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নেবো। আর এ বইয়ের পরবর্তী বর্ধিত সংস্করণে বাকী ঘটনাপ্রবাহ এবং মহাবিজয়ের খোশখবরটির জন্যে অপেক্ষার দিন গুণবো।

নাসরুম্‌মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্‌হুন কারীব!

উপরোক্ত কথাগুলো লেখার সময় আমি জানতাম না যে, মুজাহিদদের বিজয়, জিহাদের ঘটনাপ্রবাহ আর মহাবিজয়ের খোশখবরটির পাশাপাশি আমরা সমাজতন্ত্রের মরণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্টদের দুর্দিন, মধ্য-এশিয়ার ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের রাহুমুক্তির খবরও পেয়ে যাব। এসবই মূলতঃ আশাতীত ও ধারণাতীত বিষয়। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলা আফগান জিহাদের বরকতে বিশ্বব্যাপী এমন একটা পরিবর্তন সূচিত করেছেন, যা প্রত্যক্ষ করার পর আর কোন ঈমানদারই ইসলামের প্রাণশক্তির উপর পূর্ণ একীন স্থাপন না করে পারেন না। আর আফগান মুজাহিদদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পলিসিগত বিরোধের খবর শুনে হতাশ হওয়ার মতো বোকামিও কেউ করতে পারে না। পাশ্চাত্যের প্রচারণায়ও বিভ্রান্ত হতে পারে না কোন মু'মিন বান্দা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

প্রসংগঃ অণন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই

আফগান জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বাঁকেই দেখা গেছে বহিঃশত্রুদের নানা ষড়যন্ত্রের মহড়া। মুজাহিদরা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত পন্থায় এসব ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে এগিয়ে গিয়েছেন। আর তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের বিজয়ের জন্যে সংগ্রাম করেছেন বলেই তাঁদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়া সহজ হয়েছে। তবে কোন কোন বিষয়ে যে তাঁদের মধ্যে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়নি এমন নয়। কিন্তু ভিন্ন মত হলে কি হবে, তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন তো অভিন্ন। আর তাই কাবুল মুক্ত হওয়ার দিনটি থেকে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো "মুজাহিদদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই" ইত্যাদি মিথ্যা ও

বানোয়াট সংবাদ প্রচার করে বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহকে হতাশ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে, প্রজ্ঞাবান মুজাহিদ নেতাদের হস্তক্ষেপে তা এক মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কোন ঘটনা আফগানিস্তানে হয়নি, যা কাফের, নাস্তিক, খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টদের পতন ও পরাজয়ের গ্লানিকে আচ্ছাদিত এবং মুজাহিদদের বিজয় ও কাবুলের স্বাধীনতাকে করতে পারে কলুষিত। মুজাহিদদের প্রতি অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ক্ষমতার লড়াইয়ের অপবাদকে করতে পারে প্রমাণিত।

আচ্ছা, তাহলে সংঘাত হলো কেন?

সংঘাত মুজাহিদদের মধ্যে হয়নি। সংঘাত, মারামারি ও গোলাবর্ষণ হয়েছে সাবেক সরকারের সেনাবাহিনী ও নিরাপস মুজাহিদীনের মধ্যে। এতে কিছু বেসামরিক লোকজন মারা গিয়েছে। কাবুলের ঘর-বাড়ী ও অফিস-আদালতের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। আহমদ শাহ্ মাসউদ ও হিকমতইয়ারের আলোচনায় এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া হিকমতইয়ারের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণগুলোও তাঁর কতিপয় বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। কোয়ালিশন সরকার যদি তাঁর দাবীগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে আফগান জিহাদের চেতনাকে অসম্মান করে, তাহলে তিনি কাবুল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক একটা ব্যাপার। সরকারের কর্মব্যবস্থায় ভারসাম্য ও নীতি নির্ধারণে সঠিক পন্থা বজায় রাখার প্রয়োজনেই বিরোধীদলের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধীদলের অস্তিত্ব সগৌরবে বিদ্যমান, কিন্তু যতো দোষ সবই এখন মুজাহিদদের। ইঞ্জিনিয়ার হিকমতইয়ার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোয়ালিশন সরকারের বিরোধিতা করে চলেছেন। এতে মুজাহিদ সরকারের মাথা ব্যথা না থাকলেও মাথা ব্যথা আছে আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন, ভারত, রাশিয়া ও জাপানের। কারণ, মুজাহিদ সরকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্তই হিকমতইয়ার থেমে দাঁড়াতে চাচ্ছেন না। তিনি চান আফগানিস্তানে কায়েম হোক একটি জিহাদী সরকার। যারা কোন সময়ই জাতিকে নিরস্ত্র করবে না। এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে থাকবে না যাদের জিহাদী তৎপরতা।

উদাহরণস্বরূপঃ ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য বিমানবিধ্বংসী স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র আমেরিকার গর্বের ধন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বনাশ করার জন্যে তারা এসব

মারণাস্ত্র আফগানদের হাতে তুলে দিয়েছিলো। এর একাংশ এসেছিলো পাকিস্তানের মধ্যস্থতায়। আর বেশ কিছু আরবদের দেয়া চাঁদায় খরিদ করা। কাবুল বিজয়ের পর মার্কিন নেতৃবৃন্দ এসব হাতিয়ার ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট হলো। তাদের প্রস্তাবনায় তৈরি মুজাহিদ পরিষদ হয়তো এগুলোর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ায় আমেরিকার হাতে ফিরিয়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করতো, কিন্তু হিকমতইয়ার সুস্পষ্ট ভাষায় এক বেতার বাণীতে বলে দিলেন যে, "এসব স্ট্রিংগার আমাদের পয়সার কেনা অথবা কোন দেশের পক্ষ থেকে দেয়া সাহায্য। বর্তমানে এগুলোর মালিক আফগান জনসাধারণ। তাছাড়া একটি পরাশক্তির পতনে এগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। আরও অনেক যুদ্ধ বাকী রয়ে গেছে। কাশ্মীর-ফিলিস্তীন এখনো মুক্ত হয়নি, তাগুতের দর্প চূর্ণ হয়ে বিশবব্যাপী হয়নি কায়েম আল্লাহর মনোনীত শাসনব্যবস্থা। অতএব, একটি অস্ত্রও ফেরত দেয়া হবে না। জনগণকেও করা হবে না নিরস্ত্র। আফগানিস্তান সব সময়ই যুদ্ধের সাজে সজ্জিত থাকবে।" এধরনের স্পষ্ট কথাবার্তার জন্যেই এ নেতাটির ব্যাপারে বিশ্বনেতৃত্ব সীমাহীন উদ্বিগ্ন।

জনৈক মুজাহিদের বর্ণনায় আফগানিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব

হিকমতইয়ার সমর্থক জনৈক মুজাহিদের ভাষায়ঃ কাবুলের দরোজায় সপ্তাহব্যাপী অবরোধ স্থাপনকারী মুজাহিদ ও তাদের অগ্রবর্তী নেতাকে বাদ দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠান হতে চলেছে। এ পর্যায়ে মার্কিন-ভারত এবং মার্কিনীদের নিকট বিনয়াবনত মুসলিম দেশগুলোর যৌথ ব্যবস্থাপনায় আফগানিস্তানে কোয়ালিশন সরকার কায়েম করা হচ্ছে। নস্যাৎ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হলো বহু কষ্টে অর্জিত বিজয় ও স্বাধীনতা। এ জন্যে হিকমতইয়ারের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হলো জমিয়তে ইসলামী দলের প্রধান সিপাহসালার মুজাহিদ নেতা ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ মাসউদকে। তিনি জনৈক আফগান কর্নেলের পুত্র। গোটা কাবুল বাহিনী আহমদ শাহের হাতে অস্ত্র সমর্পণে রাজী। কিন্তু হিকমতইয়ারকে তাদের বড্ড ভয়। কেননা আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে হিকমতইয়ার বরাবরই আপসহীন। ইতোমধ্যে পশ্চিমা পত্র-পত্রিকায় ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ মাসউদকে আফগানিস্তানের সর্বাপেক্ষা

বড় মুজাহিদ নেতা বলে প্রচার করা শুরু হলো। আর হিকমতইয়ার হয়ে গেলেন মৌলবাদী চরমপন্থী। ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ্ মাসউদ কাবুল বিজয়ী হিসেবে পাক-মার্কিন-সউদী আরব সম্মিলিত পঞ্চায়েতের দেয়া তারিখ মতো একশত ট্যাংকের বহর সাথে করে কাবুলে পৌঁছলেন। এর চার দিন পূর্বেই হিকমতইয়ার সমর্থিত বিপ্লবী মুজাহিদরা কাবুলের সামরিক স্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিস-আদালত দখল করে নেয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রেসিডেন্ট ভবনের একপাশের ফটকে তখন হিযবে ইসলামীর সদস্যরা প্রহরারত, অপর গেইটে সাবেক কমিউনিস্ট মিলিশিয়া ও আহমদ শাহ্ মাসউদের অনুগত মুজাহিদরা।

পাকিস্তানে বসে তৈরি করা হলো আফগান মুজাহিদ সরকারের ক্ষমতাসীন পরিষদ। অথচ এর বহুদিন পূর্বেই রণক্ষেত্রে বসে ইসলামী নেতা হিকমতইয়ার নতুন সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ৫১ সদস্যের এ পরিষদে রয়েছেন কিছু মুজাহিদ নেতা, কিছু রাজনীতিক, কিছু ধর্মনিরপেক্ষ নেতা, কিছু আলেম-উলামা, কিছু আমলা-কর্মচারী এবং অল্প কিছু সাবেক কমিউনিস্ট। এর প্রধান হয়েছেন নাজাতে মিল্লীর নেতা সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী। তা-ও আবার দু'মাসের জন্যে। এরপর চার মাসের জন্যে প্রফেসর রাব্বানী। এরপর পশ্চিমা পঞ্চায়েতের যা মর্জি। অস্ত্রপাতি সব সরকার জমা নিয়ে মুজাহিদদের নিরস্ত্র করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। পৃথিবীর অন্যান্য আরও ৫০টি মুসলিম রাষ্ট্রের মতো শান্তিপূর্ণ (?) মুসলিম রাষ্ট্র আমেরিকা, ফ্রান্স ও চীন থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্রগুলো ফেরত দেবে আর সোভিয়েত সৈন্যদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রগুলোও বাক্সবন্দী করে গোডাউনে ভরবে নজীবুল্লাহর সেনাবাহিনী। কমিউনিস্ট আমলের মিলিশিয়া বাহিনীর সকলকে নিজ নিজ পদে বহাল রেখে কাবুলেই থাকতে দিতে হবে। নজীবুল্লাহসহ সকল ঘাতক, খুনী ও কুচক্রীকে ক্ষমা করে দিতে হবে। এ ধরনের অনেক শর্ত মেনে নিয়েই ক্ষমতা গ্রহণে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলেন মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ। মোজাদ্দেদী সদলবলে রওনা হবেন কাবুলের পথে। রাতেই শুনলেন হিকমতইয়ার বাহিনীর ঘোষণা, "মার্কিনীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, মিলিশিয়াদের কাবুলে অবস্থিতি মেনে নিয়ে ক্ষমতা দখল করার জন্যে কেউ কাবুলে এলে হিযবে ইসলামী সদস্যরা তার বিমানটি গুলি করে মাটিতে ফেলে দেবে।" রেডিও স্টেশন থেকে হিকমতইয়ারের এ ঘোষণা শোনার পর

পাক-সউদী-মার্কিন নেতৃবৃন্দ মনোনীত মুজাহিদ পরিষদকে সড়ক পথে শত শত গাড়ীর প্রহরায় অতি কষ্টে কাবুল পৌছানো হলো। এসময় জাতিসংঘের দেয়া অন্যান্য সকল শর্ত খুব বড় করে না দেখে হিকমতইয়ার শুধু বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে,

ঃ সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর যে কমিউনিস্ট সৈন্য আর আবদুর রশীদ দোস্তামের মিলিশিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করলাম, আমাদের মুক্ত রাজধানীর স্বাধীন সরকারের নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তায় আমরা এ বাহিনীকে পুনরায় নিয়োগ করতে পারি না। তারা তো যেকোন দিন, যেকোন সময় কমিউনিস্ট বিপ্লব করতে পারে। অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে। হত্যা করতে পারে আমাদের নেতৃবৃন্দকে। মোজাদ্দেদী, রাব্বানী আর আহমদ শাহ মাসউদ কেউই এদের হাতে নিরাপদ নন।

কাবুল বিজয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি ত্যাগ যে দলগুলোর রয়েছে, যারা চৌদ্দ বছরের জিহাদে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্মিলিত সাত দলীয় ঐক্যজোটের আমীরদের নিয়ে ছোট্ট একটি পরিষদ গঠন করে ক্ষমতা বুঝে নেয়া এবং নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের তত্ত্বাবধানে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার কায়েম করাই ছিলো হিকমতইয়ারের প্রস্তাব। কিন্তু পাশ্চাত্যের নেতারা এতে বাধা দিয়ে আফগানিস্তানের সত্যিকার মুক্তির পথ দীর্ঘায়িত করলো। আমাদের নেতা এখন প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার পথে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে, আর নিজেও অপেক্ষা করছেন কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের।

হিকমতইয়ার আসলে কি করছেন?

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে জিহাদী যিন্দেগীর পরিণত সময় পর্যন্ত হিকমতইয়ার বরাবরই সংগ্রামী। জিহাদের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত থেকেও তিনি সর্বদাই একটু ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইত্তেহাদুল ইসলামী নেতা সাইয়াফও তাঁর সমমনা মানুষ। মাওলানা ইউনুস খালেস, মাওলানা জিলানী ও হাক্কানী সবাই হিকমতইয়ারের চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা করেন।

আফগানিস্তানের ব্যাপারে তাঁর স্বপ্ন ছিলো, জিহাদের এক পর্যায়ে কাবুল মুক্ত হবে। বিজয়ী মুজাহিদরা একযোগে সেখানে গিয়ে ক্ষমতা দখল করবেন। মুজাহিদদের সাত দল বা সাবেক শাসকশ্রেণীর অংশগ্রহণ ছাড়া নিরপেক্ষ

লোকদের নিয়ে গঠিত হবে একটি কেয়ারটেকার সরকার। যারা বিপ্লবী মুজাহিদ পরিষদের নীতির আলোকে দেশ শাসন করবে। আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। এতে করেই কায়েম হবে আফগানিস্তানে জনগণের শাসন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার জিহাদী চেতনা সমুন্নত রেখে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে আফগান জাতিকে একটি জীবন্ত জাতি হিসেবে কর্মচঞ্চল রাখবে। এ দেশে কোন পরাশক্তির প্রভাব থাকবে না। থাকবে না কোন পশ্চিমা হস্তক্ষেপ। স্বাধীন দেশ। স্বাধীন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য-সাধনা। নিজস্ব চিন্তা ও আদর্শের প্রচারে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের সম্প্রচার কেন্দ্র "ভয়েস অফ ইসলাম।" জাতিসংঘের আওতামুক্ত হয়ে আফগানিস্তনে কায়েম হবে ইসলামী রাষ্ট্রপুঞ্জের নয়া সদর দফতর। পৃথিবীর যেকোন স্থানে মযলুম মুসলমানদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ ও যালেমদের শায়েস্তা করা হবে কাবুলের প্রধান কাজ। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট জেনারেল ও সাধারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, নজীবুল্লাহ ও তার আশ্রয়দাতাদের সাজা প্রদান, কাবুল থেকে সাবেক সরকারের পেটোয়া বাহিনী দোস্তাম মিলিশিয়াদের অপসারণ, বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের পদ্ধতি ও ক্ষমতাকাল তৈরিতে আমেরিকা ও তার কতিপয় মুসলমান দোসরের হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করে পূর্ণ স্বাধীন সিদ্ধান্ত। তাছাড়া মোজাদ্দেদী দু'মাস, রাব্বানী চার মাস অতঃপর ওয়াশিংটনের ইচ্ছামতো নেতা পরিবর্তন—এসব কিছুর শর্ত-শিকল ছিন্ন করে নিজেদের ইচ্ছামতো মুজাহিদরা দেশ চালাবেন। সারা বিশ্বের মুসলমানেরা একই জাতি এক দেশের মুসলমান অন্য দেশে যেতে পাসপোর্ট-ভিসা কেন লাগবে? একই পতাকার নিচে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সমবেত করে কেন্দ্রীয় খেলাফত কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে এখনও পর্যন্ত পর্বতের গিরি-গুহায়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই মহাসংগ্রামী বীর। মুজাহিদ সরকারে অংশ না নিয়ে তিনি রয়েছেন একটু দূরে।

ভালোবাসার গভীরে চেতনার দূরত্বে

ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারের সমস্ত মুজাহিদ নেতাই হিকমতইয়ারের অভিমান বা আত্মমর্যাদার পূর্ণ মূল্যায়ন করছেন। তাঁরা তাঁদের পরম প্রিয় এ মুজাহিদের আপসহীন জীবনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। একান্ত সাথীকে বাদ দিয়ে

ক্ষমতায় বসেও তাঁরা সর্বক্ষণ শুধু অন্তর্জ্বালায় তড়পাচ্ছেন। কিন্তু আর্জাতিক কূট চক্রান্তের সামনে তাঁরা সীমাহীন অসহায়। সবাই তো আর হিকমতইয়ারের মতো বেপরোয়া নন। বিপ্লবীদের মাঝেও শ্রেণীভেদ আছে। বহু চেষ্টার পর সমস্ত মুজাহিদের মান্য ব্যক্তিত্ব, ফার্স্ট কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর আহ্বান হিকমতইয়ার সরকার বাহিনী ও সাবেক কমিউনিস্ট আমলাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা বন্ধ করে অপেক্ষা করছেন, দেখছেন; মুজাহিদ সরকার সত্যি সত্যিই হিকমতইয়ারের দেয়া শর্তগুলি বাস্তবায়ন করে কিনা? মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে তাড়ায় কিনা? অতিসত্বর নির্বাচন দেয় কিনা? এসব ক্ষেত্রে নতুন কোন ষড়যন্ত্র হলে হিকমতইয়ার পুনরায় লড়াই বাধাবেন। এক পর্যায়ে হিকমতইয়ার বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদে যোগ দেয়ার জন্যে তাঁর দলের একজন মুজাহিদ ওস্তাদ আবদুস সবুর ফরিদকে অনুমতি দেন এবং সম্মিলিত মুজাহিদ কোয়ালিশন সরকারের সাথে হিযবে ইসলামীর বিরোধ কমে আসে। এসময় সারা বিশ্বের পত্র-পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয় বিরোধ নিষ্পত্তির সংবাদ। নতুন ভাবনার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের একটি প্রভাবশালী জাতীয় সাপ্তাহিকের "রাজনৈতিক ভাষ্যকার" হিসেবে আমি এ রিপোর্টটি তৈরি করিঃ

আফগান মুজাহিদদের বিরোধ মিটেছে

এবার নতুন করে ভাবতে হবে

আফগানিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও খোদাদ্রোহী দেশী-বিদেশী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৪ বছরব্যাপী জিহাদ সমাপ্ত হওয়ার পর কাবুলের শাসনক্ষমতা মুজাহিদ কাউন্সিলের হাতে সমর্পিত হওয়ার ব্যাপারে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের মধ্য করে বিরোধ মিটে গেছে। আফগান জিহাদের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের মধ্যস্থতাকারী কমিটি ঐকান্তিক চেষ্টায় গত সপ্তাহে এ বিরোধ নিষ্পত্তি হয়।

মুজাহিদ সরকার ও প্রতিবাদী হিযবে ইসলামীর প্রতিনিধিরা যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এতে হিযবে ইসলামী নেতা গুলবুদ্দীন হিকমতইয়ার-এর কতিপয় দাবী সরকার মেনে নেয়। পতিত সরকারের পার্টি ও আফগানিস্তানের

অপর একটি কমিউনিস্ট সংগঠন খাল্‌ক ও পারচাম-এর নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সমর্থক ব্যক্তিদের বর্তমান মুজাহিদ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে সমাসীন না করা এসব দাবীর অন্যতম। তবে নজীবুল্লাহর কমিউনিস্ট সরকারের অনুগত উজবেক মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে সরিয়ে নেয়ার যে দাবী হিযবে ইসলামী নেতারা শুরু থেকে করে এসেছেন, এ ব্যাপারে মুজাহিদ সরকার কি সিদ্ধান্ত নিলেন, তা অবশ্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার নাস্তিক্যবাদী শাসকের বাহিনীকে বর্তমান মুজাহিদ সরকারের বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান অনুগত বলে হিকমতইয়ার মনে করেন না। তাই তিনি জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তামের নেতৃত্বাধীন উজবেক মিলিশিয়াদের কাবুল থেকে সরিয়ে সেখানে জিহাদ ও কুরবানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুজাহিদ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের নিযুক্ত করার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন, নজীব বাহিনীর হাতে ইসলামী সরকার ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ নিরাপদ নন। বর্তমান মুজাহিদ কাউন্সিল ভেতর-বাইর বা অন্য কোন অজ্ঞাত চাপের মুখে এই বাহিনীকে কাবুলে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অনুমিত হচ্ছে। তবে হিকমতইয়ার মিলিশিয়াদের বহিষ্কারের দাবীতে সোচ্চার।

আপাততঃ যে কয়েকটি চুক্তিতে মুজাহিদরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, সেগুলো আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা ও শান্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। তবে জাতিসংঘ ও আমেরিকার দেয়া ফর্মুলায় যদি মুজাহিদ কাউন্সিল দেশ চালায়, তবে তাদের অর্জিত বিজয় নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, ইসলাম বিরোধীরা কখনই একটি নতুন ইসলামী শক্তির উত্থান কামনা করতে পারে না। এই নতুন শক্তিটি যদি জিহাদী ধারার ইসলামী শক্তি হয়, তবে তো কথাই নেই।

এ পর্যায়ে হিযবে ইসলামী নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাসীন মুজাহিদ কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত জিহাদী সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দকে সুচিন্তিত ও বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং পরাশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে একান্ত স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত মনোবৃত্তি নিয়ে রচনা করতে হবে বিশ্বের অপরাজেয় একটি নতুন পরাশক্তির

ভিত্তিমূল। পাকিস্তান থেকে শুরু করে সদ্য স্বাধীন ও সমাজতন্ত্রের পাঞ্জামুক্ত মুসলিম মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলো হয়ে সুদূর আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত নতুন একটি ইসলামী গণজাগরণ সংগঠিত করার পথে আফগানিস্তানকে হতে হবে সেতুবন্ধ। জিহাদী কর্মপন্থার প্রজ্বলিত মশাল। ভয়-ভীতি ও প্রভাবমুক্ত স্বাধিকার চেতনার অনুকরণীয় আদর্শ। বইটির সম্পাদনা যখন শেষের দিকে, তখন আফগান সরকার ও হিযবে ইসলামীর মধ্যে আরও বেশি নৈকট্য সৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে। সর্বশেষ আফগান পরিস্থিতি হিসেবে ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করেই আমি বইয়ের সমাপ্তির দিকে এগুবো।

পারস্পরিক সমঝোতার ফলে
কাবুল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারীরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাবুল থেকে কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের প্রত্যাহার পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে গত ২১শে নভেম্বর ৯২ শনিবার সরকার ও হিযবে ইসলামীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন।

মধ্যস্থতাকারী নেতা শোমালি খান জানান, কোয়ালিশন সরকার থেকে ৫ জন এবং হিযবে ইসলামী থেকে ৫ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে।

হিযবে ইসলামী নেতা হিকমতইয়ার কমিউনিস্ট মিলিশিয়াদের প্রত্যাহার না করলে রাজধানীতে অবস্থানরত সরকারী বাহিনীর উপর হামলা করার হুমকি দিয়েছেন।

সরকারী সূত্রে বলা হয়, অধিকাংশ মিলিশিয়াকে রাজধানীর উপকণ্ঠে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কাবুলের বাইরে জনাব হিকমতইয়ারের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। এই সময় জনাব হিকমতইয়ার কমিটিতে ৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে সম্মত হন। এই কমিটি কিভাবে মিলিশিয়া প্রত্যাহার এবং কিভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা হবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

শেষ কথা

সব শেষে বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতার কাছে আরযঃ আপনারা ভেবে দেখুন, খোদাদ্রোহী শাসন ও বিশ্ব জুড়ে তাগুতী শক্তির বিস্তৃত জালে আটকা পড়ে আমরা যে ধরনের বে-ইজ্জতী, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, শোষণ ও গঞ্জনার জিন্দেগী কাটাচ্ছি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, নাস্তিক্যবাদী সামন্তবাদ, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন, ইহুদী সম্প্রসারণবাদ, ইত্যাকার ডান-বামের দেশীয় স্বার্থপর এজেন্টদের খপ্পরে পড়ে ঈমান-সম্মান-স্বাধিকার-শান্তি-নিরাপত্তা-স্থিতি-নিশ্চয়তা-উন্নতি- সমৃদ্ধি সবকিছু হারিয়ে আজ আমরা হতাশাগ্রস্ত, স্বপ্নহীন একটি মিসকীন ও প্রাণস্পন্দনহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। এ দুর্বিষহ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে জন্ম নেয়া অন্যায়-অত্যাচার, দুর্নীতি-পাপাচার-নির্লজ্জতা-বেহায়াপনার পচা ভাগাড় হতে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের কোন্ পথটি বেছে নিতে হবে?

আমার তো মনে হয়, আফগান জিহাদের পদাংক অনুসরণ করে খোদাভীতি, ঈমান, আমল-ইখলাস ও সশস্ত্র সংগ্রামের খুনরাঙ্গা পথই বেছে নিতে হবে। শুধু বাংলাদেশের এগার কোটি মুসলমানেরই নয়, বরং বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উম্মতে মুহাম্মদীর ১২৫ কোটি সদস্যকেই বেছে নিতে হবে এই খুনরাঙ্গা পথ।

কারণ, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেনঃ যে **ব্যক্তি জিহাদ না করে বাা জিহাদের বাসনা বুকে লালন না করে মৃত্যুবরণ করলো, সে মোনাফেকীর একটি পর্যায়ের উপর মারা গেলো।** (জিহাদ পর্ব, জিহাদ বর্জনে অনীহা অধ্যায়, আবু দাউদ শরীফ, পৃঃ ৩৩৯-করাচী সংস্করণ ১৯৫২)

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ **যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জীবন তাঁর শপথ! আল্লাহর পথে লড়াই করতে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি—এতে আমি নিহত হই—পুনরায় জীবিত হই—আবার শহীদ হই—ফের জীবন ফিরে পাই, অতঃপর আবার নিহত হই।** (তামান্নী পর্ব, বুখারী শরীফ, ২য় ভলিয়ম, পৃষ্ঠা-১০৭৩, রশিদিয়া, দিল্লী সংস্করণ।)

সুতরাং নিজের হৃৎপিণ্ডের তপ্ত-তাজা রক্ত দিয়ে আল্লাহর-দ্বীনের বাগিচাকে সিঞ্চিত করার জন্যে আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময়। আল্লাহ তাওফীক দিন। আমীন!

আমরা এখন কি করবো?

আফগান মুজাহিদীনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সার্বিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন ও পূর্ব-ইউরোপসহ সারা বিশ্বের সকল মযলুম মুসলমানের বিজয় ও সাফল্যের জন্যে, বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবিধান ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্যে দোআ ও সংগ্রাম করবো। বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণ ও মুসলিম জাতির পুনরুত্থানের আন্দোলনে সমর্থন ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবো এবং সমকালীন বিশ্বের সকল খোদাদ্রোহী শক্তি, ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের চতুর্মুখী হামলা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকবো। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংস, সমাজতন্ত্রের মত পুঁজিবাদের অপমৃত্যু; কমিউনিজমের মতো পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ব্যর্থতার জন্যে অপেক্ষা করবো। পাশাপাশি আগামী শতাব্দীর পৃথিবীতে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থারূপে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের সুযোগ্য সৈনিক হিসেবে নিজের ঈমান, আমল ও আখলাক গড়ে তোলার প্রয়াস চালাবো। আর সদা-সর্বদা মনে রাখবো, হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাযিঃ)-এর স্মরণীয় বাণীটি, যা তিনি আফ্রিকার একটি বিশাল সাম্রাজ্য বিজয়ের পর তাঁর সেনাবাহিনী ও মুসলিম নাগরিকদের উদ্দেশে বলেছিলেন; আনতুম ফী রিবাতিন দা-য়িম। তোমরা সদা সতর্ক প্রহরীর মতো সীমান্ত প্রহরায় রয়েছো। সাবধান এক মুহূর্তের জন্যেও গাফেল হয়ো না। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করো না। ঈমান-আকীদা, ইয্যত-সম্মান ও স্বাধীনতার সীমানায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থেকো।

কিতাব কেন্দ্র প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

- বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ / ৭০
- ইতিহাসের কান্না / ৪০
- নবীজী (সাঃ) কেমন ছিলেন / ৬০
- অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) / ৫০
- অন্তিম শয্যায় খ্যাতিমানদের শেষ উক্তি / ৫০
- আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনী / ৫০